মহাভারত

ALLY RIVERS THOMPSON SCHOOL.

SESSION 1945.

This book is awarded to

Class, being the prize

eneral proficiency.

BALLY, 1947.

Jyotsna Kumar Banerjee,
Hon. Secretary.

বঙ্গের এবং বিহার ও উড়িষ্যার ডিরেক্টর-মহোদয়গণ কর্ত্তৃক অনুমোদিত

ছোটদের মহাভারত

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

প্রণীত

—— ❊ ——

সিটি বুক্ সোসাইটি

৬৪নং কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

১৩৫২

বিংশ সংস্করণ] [মূল্য ১৷৷৹ আনা

যোগীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের

ছোটদের রামায়ণ

২১শ সংস্করণ—মূল্য ॥৵০ আনা

১ম সংস্করণ—১৩২৬

২য় সংস্করণ—১৩২৭

৩য় সংস্করণ—১৩২৮

৪র্থ সংস্করণ—১৩২৯

৫ম সংস্করণ—১৩৩১

৬ষ্ঠ সংস্করণ—১৩৩৩

৭ম সংস্করণ—১৩৩৪

৮ম সংস্করণ—১৩৩৫

৯ম সংস্করণ—১৩৩৬

১০ম সংস্করণ—১৩৩৬

১১শ সংস্করণ—১৩৩৯

১২শ সংস্করণ—১৩৪০

১৩শ সংস্করণ—১৩৪২

১৪শ সংস্করণ—১৩৪৩

১৫শ সংস্করণ—১৩৪৫

১৬শ সংস্করণ—১৩৪৬

১৭শ সংস্করণ—১৩৪৭

১৮শ সংস্করণ—১৩৫০

প্রকাশক :—

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ সরকার,

১০২ পার্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রিণ্টার—শ্রীপঞ্চানন দাস,

সত্যনারায়ণ প্রেস,

২৮।৪এ, বিডন রো, কলিকাতা

সূচী

যোগীন্দ্রবাবুর শিশুপাঠ্য পুস্তকের তালিকা

প্রত্যেকখানি ডিরেক্টর কর্তৃক

অনুমোদিত

হাসি খুসি—১ম ভাগ ৪৪শ সং—।০ আনা		সীতা ৫ম সংস্করণ—॥০ আনা
হাসি খুসি—২য় ভাগ ২৫শ সং—॥০ আনা	হাসি ও খেলা ১৭শ সংস্করণ—॥৵০ আনা	দ্রৌপদী ২য় সংস্করণ—।৵০ আনা
ছবির বই ১৯শ সংস্করণ—।০ আনা	ছবি ও গল্প ১৫শ সংস্করণ—১৲ টাকা	নল-দময়ন্তী ৬ষ্ঠ সংস্করণ—।/০ আনা
নূতন ছবি ১৩শ সংস্করণ—।০ আনা	ছোটদের রামায়ণ ২০শ সংস্করণ—॥৵০ আনা	সাবিত্রী-সত্যবান ৬ষ্ঠ সংস্করণ—।/০ আনা
মজার গল্প ১০শ সংস্করণ—।/০ আনা	খেলার গান ৪র্থ সংস্করণ—।৵০ আনা	শ্রীবৎস ৫ম সংস্করণ—।/০ আনা
আষাঢ়ে স্বপ্ন ১৫শ সংস্করণ—।/০ আনা	ছড়া ও পড়া ৪র্থ সংস্করণ—॥০ আনা	ধ্রুব ৪র্থ সংস্করণ—।০ আনা
খেলার সাথী ১০শ সংস্করণ—।/১০ আনা	খুকুমণির ছড়া ১০ম সংস্করণ—১৲ টাকা	প্রহ্লাদ ৩য় সংস্করণ—।০ আনা
রাঙা ছবি ২১শ সংস্করণ—।৶০ আনা	মোহনলাল ২য় সংস্করণ—॥০ আনা	শকুন্তলা ৬ষ্ঠ সংস্করণ—।০ আনা
হিজিবিজি ৯ম সংস্করণ—।৶০ আনা	গল্প-সঞ্চয় নূতন সংস্করণ—১।৵০ আনা	হরিশ্চন্দ্র ৬ষ্ঠ সংস্করণ—।০ আনা
হাসিরাশি ২০শ সংস্করণ—॥৵০ আনা	আগমনী নূতন সংস্করণ—১।০ আনা	পশু-পক্ষী ৫ম সংস্করণ—২।০ আনা
হাসির গল্প ৭ম সংস্করণ—॥৵০ আনা	ভীষ্ম ২য় সংস্করণ—।৵০ আনা	শিশুপাঠ্য গ্রন্থাবলী উৎকৃষ্ট সংস্করণ—৫৲ টাকা

বই ত নয়—যেন এক একখানি হীরার টুকরা

দেখিলেই চক্ষু জুড়াইবে।

শান্তনু ও গঙ্গাদেবী

ছোটদের মহাভারত
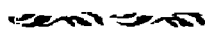
আদিপর্ব

সেকালে দিল্লীর কাছে হস্তিনা নামে এক নগর ছিল। রাজা প্রতীপের পুত্র শান্তনু সেই হস্তিনায় রাজত্ব করিতেন। শান্তনু এমন ভাল লোক ছিলেন যে স্বয়ং গঙ্গাদেবী পৃথিবীতে আসিয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন।

দেবব্রত নামে এক পুত্র রাখিয়া গঙ্গাদেবী স্বর্গে চলিয়া যান। ইহার পর একদিন শান্তনু যমুনার তীরে বেড়াইতে গিয়া অপরূপ সুন্দরী একটি কন্যা দেখিতে পাইলেন। তাঁহার দেহের সৌরভে চারিদিক ভরিয়া উঠিয়াছিল।

এই কন্যার নাম ছিল সত্যবতী। শিশুকাল হইতে এক ধীবর তাঁহাকে পালন করিয়াছিল। সত্যবতীর রূপে মোহিত হইয়া রাজা ধীবরের কাছে গিয়া তাহার এই পালিত কন্যাটিকে বিবাহ করিতে চাহিলেন।

ধীবর বলিল, "মহারাজ, আপনার দেবব্রতের মত সোনার চাঁদ ছেলে থাকিতে সত্যবতীর ছেলের রাজ্য পাইবার কোনই সম্ভাবনা নাই, কাজেই এই বিবাহে আমি মত দিতে পারি না।"

ইহাতে শান্তনু এতই দুঃখিত হইলেন যে, রাজ কার্যে মনোযোগ দেওয়া দূরে থাক, নিয়মিত খাওয়া-পরা পর্যন্ত ছাড়িয়া দিলেন। পিতার দুঃখের কারণ জানিতে পারিয়া দেবব্রত একদিন ধীবরের কাছে গিয়া বলিলেন, "আমার পিতার সহিত আপনার কন্যার বিবাহ দিন। ভবিষ্যতে তাঁহার পুত্রই রাজা হইবেন। প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমি কখনও সিংহাসন দাবী করিব না।"

ধীবর বলিল, "কুমার, এ প্রতিজ্ঞা আপনারই যোগ্য বটে, কিন্তু সিংহাসন লইয়া পরে আপনার পুত্রেরা যে গোল-যোগ করিবেন না, তাহার নিশ্চয়তা কি?" তখন দেবব্রত বলিলেন, "আচ্ছা, আবার প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি বিবাহও করিব না।"

দেবব্রতের এই প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া সকলে চমকিত হইলেন। দেবতারা পর্যন্ত আনন্দে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। এই ভীষণ প্রতিজ্ঞার জন্য এখন হইতে তাঁহার নাম হইল 'ভীষ্ম'।

ইহার পর শান্তনুকে কন্যা দিতে ধীবরের আর কোনই আপত্তি রহিল না। পুত্রের এই কার্যে রাজা যার-পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন এবং এই বর দিলেন যে, ভীষ্ম নিজে ইচ্ছা করিয়া না মরিলে কখনও তাঁহার মৃত্যু হইবে না।

মহাসমারোহে রাজা শান্তনু ও সত্যবতীর বিবাহ হইয়া গেল। তার পর যথাক্রমে তাঁহাদের চিত্রাঙ্গদ আর

বিচিত্রবীর্য্য নামে দুই পুত্র হইল। শান্তনুর মৃত্যুর পর প্রথমে চিত্রাঙ্গদ পরে বিচিত্রবীর্য্য পিতার সিংহাসনে বসিলেন; ভীষ্ম রাজ্যের সকল অধিকার ত্যাগ করিয়াও রাজকার্য্যের সমস্ত ভার আনন্দের সহিত বহন করিতে লাগিলেন।

বিচিত্রবীর্য্য বড় হইলে, তাঁহার বিবাহের জন্য ভীষ্ম স্বয়ম্বর সভা হইতে অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকা নামে কাশী-রাজের তিনটি কন্যা হরণ করিয়া আনিলেন। ইহাদের মধ্যে অম্বা মনে মনে সৌভরাজ শাল্বকে ভালবাসিতেন। এ কথা জানিতে পারিয়া ভীষ্ম তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া অম্বিকা ও অম্বালিকার সহিত বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহ দিলেন। কালক্রমে এই দুই কন্যার দুইটি পুত্র হইল। অম্বিকার পুত্রের নাম হইল ধৃতরাষ্ট্র, তিনি ছিলেন জন্মান্ধ। আর অম্বালিকার পুত্রের নাম পাণ্ডু। ইহাদের আর একটি বৈমাত্রেয় ভাই ছিলেন, তাঁহার নাম বিদুর।

অন্ধ ছিলেন বলিয়া ধৃতরাষ্ট্র পিতার মৃত্যুর পর রাজা হইতে পারিলেন না। দেশের লোক পাণ্ডুকেই সিংহাসনে বসাইল। ইহাতে ধৃতরাষ্ট্র খুবই দুঃখিত হইলেন। যাহা হউক, পরে তাঁহার ছেলে রাজা হইতে পাইলেও সে দুঃখ অনেকটা কমিয়া যাইত। কিন্তু হায়, অন্ধের কপালদোষে পাণ্ডুরই আগে ছেলে হইল! বয়সে যে বড়, সে-ই ত রাজা হইবে!

পাণ্ডুর বড় ছেলের নাম যুধিষ্ঠির। ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও

সহদেব নামে তাঁহার আরও চারি পুত্র ছিলেন। ইহাদের এক একটি এক একজন দেবতার আশীর্ব্বাদে জন্মগ্রহণ করেন; তাই লোকে যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম্ম-পুত্র, ভীমকে পবন-পুত্র, অর্জ্জুনকে ইন্দ্র পুত্র এবং নকুল ও সহদেবকে অশ্বিনী-কুমারদ্বয়ের পুত্র বলিয়া থাকে।

ইহাদের মধ্যে যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুন এক মায়ের ছেলে। তাঁহার নাম কুন্তী; তিনি কুন্তীভোজ রাজার পালিত কন্যা। আর নকুল ও সহদেব পাণ্ডুর দ্বিতীয় রাণীর ছেলে। তাঁহার নাম মাদ্রী; তাঁহার পিতা ছিলেন মদ্রদেশের রাজা।

ধৃতরাষ্ট্রের দুর্য্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি এক শত ছেলে আর দুঃশলা নামে একটি মেয়ে ছিল। ইহাদের মায়ের নাম গান্ধারী; গান্ধার রাজ সুবল তাঁহার পিতা।

পাণ্ডু কুরুবংশের রাজা হইলেও তাঁহার ছেলেগুলিকে লোকে 'পাণ্ডব' বলিত আর ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেদের বলিত 'কৌরব'।

বড় হইলে যুধিষ্ঠির হস্তিনার সিংহাসনে বসিবেন, এ দুঃখ কি আর দুর্য্যোধন প্রভৃতির সহ্য হয়! ছেলেবেলা হইতেই পাণ্ডবদের হিংসায় তাহাদের বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। এই জন্য তাহাদিগকে কেহ দেখিতে পারিত না।

এদিকে পাণ্ডুর ছেলেদের সরল মিষ্ট ব্যবহারে সকলেই সুখী হইত। কিন্তু পাণ্ডবদের সুখের দিন দেখিতে দেখিতে ফুরাইয়া গেল। অতি শিশু কালেই তাঁহারা পিতৃহীন হইলেন

এবং মাদ্রীদেবীও তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন। তখন যুধিষ্ঠির, ভীম প্রভৃতি পাঁচ ভাই ধৃতরাষ্ট্রের এক শত ছেলের সহিত একসঙ্গে বাস করিতে লাগিলেন। এই এক শত পাঁচ ভাইএর মধ্যে পাণ্ডুর দ্বিতীয় পুত্র ভীম ছিলেন সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্। তাঁহাকে সকলেই ভয় করিয়া চলিত।

একদিন দুর্য্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি কৌরবেরা গোপনে পরামর্শ করিল যে, বড় হইলে এই ভীমের সহিত আঁটিয়া উঠা একেবারেই অসম্ভব হইবে, অতএব কোন রকমে ইহাকে এখনই মারিয়া ফেলা চাই। তারপর যুধিষ্ঠিরকে তাড়াইয়া রাজ্য অধিকার করিতে আর কতক্ষণ! এই স্থির করিয়া তাহারা ভীমকে মারিবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিল। শেষে একদিন গঙ্গাস্নানে গিয়া দুর্য্যোধন তাঁহাকে মিষ্টান্নের সহিত বিষ খাওয়াইতেও লজ্জাবোধ করিল না; শুধু তাহাই নয়, ভীম অজ্ঞান হইয়া পড়িলে হতভাগ্য তাঁহাকে জলে ফেলিয়া দিল!

ইহাতে কিন্তু ফল হইল বিপরীত। ভীম ডুবিতে ডুবিতে পাতালে উপস্থিত হইলেন। সেই সাপের রাজ্যে কাহারও কি রক্ষা আছে! ভীমের কিন্তু ভালই হইল। সাপের দংশনে তাঁহার গায়ের বিষ নষ্ট হইয়া গেল। ইহার পর সাপেদের রাজা বাসুকী তাঁহাকে আদর-যত্ন করিয়া অমৃত খাইতে দিলেন। রাশি রাশি অমৃত খাইয়া ভীমের দেহে দশ হাজার হাতীর বল হইল।

এই ঘটনা হইতে আর একটা উপকার হইয়াছিল। দুর্য্যোধন প্রভৃতির অন্তর যে কত কুটিল, পাণ্ডবেরা তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং সেই জন্য এখন হইতে তাঁহারা বিশেষ সতর্ক হইয়া চলিতে লাগিলেন।

ক্ষত্রিয়ের ছেলেরা শাস্ত্রপাঠের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধবিদ্যাও শিখিতে আরম্ভ করে। রাজকুমারগণ কৃপাচার্য্য নামে একজন শিক্ষকের নিকট ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা করিতেন। ভীষ্মের কিন্তু বরাবর এই ইচ্ছা যে, ভরদ্বাজ মুনির পুত্র সুবিখ্যাত দ্রোণাচার্য্যের উপর ছেলেদের অস্ত্রশিক্ষার ভার দেন।

ঘটনাক্রমে একদিন দ্রোণ নিজেই হস্তিনায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সে অতি আশ্চর্য্য ঘটনা।

বাল্যকালে পাঞ্চাল রাজ দ্রুপদের সহিত আচার্য্য দ্রোণের খুব বন্ধুত্ব ছিল। তখন দ্রুপদ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি রাজা হইলে দ্রোণকে রাজ্যের অংশ দিবেন।

রাজা হইয়া দ্রুপদ কিন্তু সে প্রতিজ্ঞার কথা ভুলিয়াই গেলেন। একদিন নিতান্ত দুঃখে পড়িয়া দ্রোণ তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলে, দ্রুপদ প্রথমে তাঁহার বাল্যবন্ধুকে চিনিতেই পারিলেন না। শেষে এমন অবজ্ঞার ভাব দেখাইতে লাগিলেন যে, অপমানে দ্রোণের মুখ লাল হইয়া উঠিল। আর এক মুহূর্ত্তও সেখানে না দাঁড়াইয়া তিনি প্রতিশোধের উপায় চিন্তা করিতে করিতে হস্তিনায় চলিয়া আসিলেন।

সহরের বাহিরে পঁহুছিয়াই দ্রোণ দেখিলেন, রাজবাড়ীর

ছেলেরা উৎসাহের সহিত একটা লোহার গোলা লইয়া খেলা করিতেছে ; খেলিতে খেলিতে গোলাটা হঠাৎ এক কূয়ার মধ্যে পড়িয়া গেল। তখন সকলেই উহা উঠাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিল বটে, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইল না। আচার্য্য এই ব্যাপার দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ছিঃ! ছিঃ! ক্ষত্রিয়ের ছেলে হইয়া তোমরা এই সামান্য কাজটা পারিলে না! এই দেখ, আমি গোলা তুলিয়া দিতেছি।" এই বলিয়া তিনি একটা শর লইয়া ঐ গোলাতে বিদ্ধ করিলেন। তার পর শরের পিছনে শর—তার পিছনে আর একটা শর, পরে পরে এইভাবে বিদ্ধ করিয়া শেষের শরটি ধরিয়া অক্লেশেই গোলা টানিয়া তুলিলেন। গোলা উঠান হইলে ব্রাহ্মণ কূয়ার মধ্যে নিজের আংটি ফেলিয়া তাহাও ঐরূপ কৌশলে উঠাইয়া আনিলেন। ব্যাপার দেখিয়া সকলে ত অবাক্!

দেখিতে দেখিতে এ খবর চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। ব্রাহ্মণের আশ্চর্য্য শক্তির কথা শুনিয়া ভীষ্মের আর বুঝিতে বাকী রহিল না যে, স্বয়ং দ্রোণাচার্য্য আসিয়াছেন। কেন না, এ কাজ আর কাহারও দ্বারা সম্ভব হইতে পারে না। তিনি মনে মনে এতদিন যাহা চাহিতেছিলেন, তাহাই হইল; দ্রোণ নিজেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ইহার পর আচার্য্যকে যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া ভীষ্ম তাঁহার উপর ছেলেদের অস্ত্রশিক্ষার ভার দিলেন।

এরূপ আদর যত্ন এবং হঠাৎ এতগুলি শিষ্য পাইয়া দ্রোণের তখন কি আনন্দ। তিনি বলিলেন, "বৎসগণ, আমি তোমাদিগকে এমন করিয়া যুদ্ধবিদ্যা শিখাইব যে, লোকের তাক্ লাগিয়া যাইবে! শেষে কিন্তু আমার একটি কাজ করিয়া দিতে হইবে।"

আচার্য্যের কথা শুনিয়া আর সকলেই চুপ্ করিয়া রহিলেন। কেবল অর্জ্জুন বলিলেন, "বলুন, কি করিতে হইবে? আপনার আদেশ কখনও অমান্য করিব না।"

অর্জ্জুনের কথায় প্রীত হইয়া দ্রোণ তাঁহাকে বুকে টানিয়া লইয়া আদর করিলেন। তারপর চোখের জল মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "সে কথা পরে বলিব।" সেই দিন হইতে আচার্য্য অর্জ্জুনকে ঠিক নিজের ছেলের মত ভালবাসিতে লাগিলেন!

যথারীতি ছেলেদের অস্ত্রশিক্ষা আরম্ভ হইল। রাজকুমার-দের সহিত আর যাহারা দ্রোণের নিকট শিক্ষা পাইত, তাহাদের মধ্যে কর্ণই প্রধান। এই কর্ণকে লোকে অধিরথ সারথির ছেলে বলিয়া জানিত। কিন্তু বাস্তবিক সে যুধিষ্ঠির-দেরই সহোদর—কুন্তীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। কর্ণের জন্মের পর কুন্তী তাহাকে পরিত্যাগ করেন। তখন হইতে অধিরথ নামে এক সারথি তাহাকে পালন করিতেছিল! কুন্তী যে কর্ণের মা, এ কথা আর কেহই জানিত না। কর্ণ নিজেও এ কথা অনেক কাল পর্য্যন্ত জানিতে পারে নাই।

দ্রোণের শিক্ষাগুণে কয়েক মাসের মধ্যে সকলেরই খুব উন্নতি হইল। ধনুর্ব্বিদ্যায় অর্জ্জুন একজন অদ্বিতীয় বীর হইয়া উঠিলেন। গদায় দুর্য্যোধন ও ভীম এবং খড়্গে নকুল ও সহদেব খুব নাম কিনিলেন। আচার্য্যের মুখে অর্জ্জুনের প্রশংসা আর ধরে না। তিনি মনে করিলেন, 'এই প্রিয় শিষ্যটিকে এমন সকল কৌশল শিখাইব যে, পৃথিবীতে কেহই যেন ইহার সহিত আঁটিয়া উঠিতে না পারে।' আর সত্যই, কাজেও তিনি তাহা করিলেন।

অর্জ্জুনের আদর দেখিয়া হিংসায় দুর্য্যোধন আর বাঁচে না! কর্ণ বরাবরই অর্জ্জুনকে ঘৃণা করিত। এখন হইতে সে-ও দুর্য্যোধনের দলে যোগ দিয়া কথায় কথায় পাণ্ডবদের অপমান করিতে লাগিল।

এই সময় একদিন দ্রোণ কুমারগণের পরীক্ষার জন্য একটি নীল রঙ্গের পাখী প্রস্তুত করাইয়া গাছের ডালে বসাইয়া দিলেন। তার পর সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, "ঐ যে পাখীটি দেখিতেছ, উহার মাথা লক্ষ্য করিয়া তীর ছুড়িতে হইবে। মাথাটি কাটিয়া ফেলিতে পারিলে বুঝিব, আমার পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে!"

এ কথায় চারিদিকেই উৎসাহের স্রোত বহিতে লাগিল। ক্রমে রাজকুমারগণ তীর-ধনুক লইয়া প্রস্তুত হইলেন। তখন দ্রোণ যুধিষ্ঠিরকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল দেখি, কি দেখিতেছ?" যুধিষ্ঠির বলিলেন, "একটা পাখী দেখিতেছি!"

দ্রোণ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর কি দেখিতেছ ?" যুধিষ্ঠির বলিলেন, "গাছের ডাল-পালা সবই দেখিতেছি, আপনাদের সকলকেও দেখিতেছি ।"

এরূপ উত্তরে দ্রোণ সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না ; বলিলেন, "না বাপু, এখনও তোমার নজরই ঠিক হয় নাই ।"

ইহার পর তিনি এক এক করিয়া প্রায় সকলকেই ডাকিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার মনের মত উত্তর দিতে পারিল না। শেষে অর্জ্জুনকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি বল দেখি কি দেখিতেছ ?" অর্জ্জুন বলিলেন, "আমি শুধু পাখীর মাথা দেখিতেছি ; আর কিছুই না।" এইবার দ্রোণের মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, মাথাটি কাট দেখি ?" আচার্য্যের মুখের কথা না ফুরাইতেই অর্জ্জুনের বাণে পাখীর কাটা মাথা মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

আর একদিন দ্রোণকে কুমীরে ধরিয়াছিল। তিনি ইচ্ছা করিলেই কুমীর মারিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা না করিয়া, যেন মহা বিপদেই পড়িয়াছেন, এইরূপ ভাণ করিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। কুমারেরা ত ভয়ে একেবারে জড়সড় ! কিন্তু অর্জ্জুনের মনে ভয়ের লেশমাত্র নাই। তিনি তখনই কয়েকটা বাণ মারিয়া কুমীরকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন।

ইহাতে দ্রোণ যে কিরূপ সন্তুষ্ট হইলেন, তাহা আর কি বলিব ! তিনি অর্জ্জুনকে আশীর্ব্বাদ করিয়া 'ব্রহ্মশিরা' নামে এক অস্ত্র পুরস্কার দিলেন ; সে অতি ভয়ানক অস্ত্র। তাহার

তাতে স্বর্গ মর্ত্ত্য কাঁপিয়া উঠে। মানুষের উপর সে অস্ত্র ছাড়িতে আচার্য্য কিন্তু অর্জ্জুনকে নিষেধ করিয়া দিলেন।

ইহার পর আরও কিছুদিন চলিয়া গেল। ক্রমে সকলেই এক একজন বীর হইয়া উঠিলেন। এইবার দশজনের সাক্ষাতে কুমারদের রণকৌশল প্রদর্শনের সময় উপস্থিত।

দ্রোণের পরামর্শে অন্ধরাজ প্রকাণ্ড এক রঙ্গভূমি প্রস্তুত করাইলেন। উহার মাঝখানে খেলিবার স্থান এবং চারিদিকে রাজা-রাজড়া ও বড় বড় বীরদিগের বসিবার জন্য সুন্দর সুন্দর মঞ্চ। মহিলাগণের জন্য স্বতন্ত্র আসন। বিচিত্র পত্র-পুষ্পে নিশাণ-ঝালরে সমুদয় রঙ্গভূমি ঝল্‌মল্‌ করিতে লাগিল।

অগ্রেই দেশে দেশে ঢোল পিটাইয়া এ সংবাদ ঘোষণা করা হইয়াছিল। পরীক্ষার দিন রঙ্গভূমি একেবারে লোকে লোকারণ্য। তাহাদের কোলাহলে ও বাদ্যের শব্দে সারা দেশ মাতিয়া উঠিল।

যথাসময়ে ধৃতরাষ্ট্র এবং ভীষ্ম, কৃপ, বিদুর প্রভৃতি সভায় প্রবেশ করিলেন। তারপর মান্য ব্যক্তিগণের অভ্যর্থনা চলিতে লাগিল; ক্রমে মহিলাগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শেষে দেশ-বিদেশের ছোট-বড় কেহই আর আসিতে বাকি থাকিল না। সকলে আপন আপন আসন গ্রহণ করিলে, আচার্য্য দ্রোণ শ্বেত বসন-ভূষণে সজ্জিত হইয়া রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিলেন।

সর্ব্বাগ্রে দেবতাদিগের পূজা হইল। তার পর কুমারগণ

সারি বাঁধিয়া দলে দলে দেখা দিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সাজসজ্জা আর অস্ত্রের চাক্‌চিক্যে চারিদিক্ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

জয়ধ্বনি ও বাদ্য কোলাহল থামিলে দুর্য্যোধন আর ভীম গদাহস্তে অগ্রসর হইলেন; তাঁহাদের চাল চলন ও যুদ্ধের কৌশল কি সুন্দর! কিন্তু কিছুক্ষণ খেলিতে খেলিতে উভয়ে এমন উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন যে, দ্রোণাচার্য্য ভয় পাইয়া তাঁহাদিগকে থামাইয়া দিতে বাধ্য হইলেন।

গদা খেলার পর কুমারগণ দুই দলে বিভক্ত হইয়া নকল যুদ্ধের অভিনয় দেখাইয়া সকলকে চমৎকৃত করিলেন।

শেষে আসিলেন অর্জ্জুন। যেমন বীরের ন্যায় চেহারা তেমনি তাঁহার হাতের কায়দা। তিনি অগ্নিবাণে চারিদিকে আগুন জ্বালাইয়া, বরুণ-বাণে তখনই আবার তাহা নিভাইয়া ফেলিলেন। এক বাণে আকাশে বায়ু ও মেঘের সৃষ্টি করিলেন; এক বাণে বিশাল পর্ব্বত গড়িলেন; এক বাণে নিজেই ভূমিতে প্রবেশ করিয়া পর মুহূর্ত্তেই আবার বাহিরে আসিলেন। তাঁহার বাণে কখনও রৌদ্র, কখনও মেঘ, কখনও বৃষ্টি,—যেন বাজীকরের ভেল্কি! লোকের চোখে কাণে ধাঁধা লাগিয়া গেল। শেষে অর্জ্জুন এক বাণে আপনাকে এমন করিয়া লুকাইলেন যে, কেহ আর তাঁহাকে দেখিতেই পাইল না। কি আশ্চর্য্য শিক্ষা! অর্জ্জুনের জয়ধ্বনিতে চারিদিক্ ভরিয়া উঠিল।

অর্জ্জুনের খেলা ঠিক শেষ হইয়াছে, এমন সময় ফটকের কাছে ভয়ঙ্কর একটা শব্দ হইল। সে এমন শব্দ যে সমস্ত সভা কাঁপিয়া উঠিল। মনে হইল যেন বাজ পড়িয়াছে। কিন্তু উহা বাজ নহে—কর্ণের হুঙ্কার! এই কর্ণের কথা তোমরা পূর্ব্বে কিছু কিছু শুনিয়াছ। তিনি বড় যেমন তেমন বীর নহেন, অভেদ্য কবচ ও কুণ্ডল লইয়াই তিনি জন্মগ্রহণ করেন। অর্জ্জুনের প্রশংসা কি তাঁহার সহ্য হয়! কর্ণ আসিয়াই, অর্জ্জুন যাহা যাহা করিয়াছিলেন, প্রায় সকল খেলাই দেখাইলেন। শেষে স্পর্দ্ধা করিয়া বলিলেন, "আমি অর্জ্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছি।"

দুর্য্যোধন এতক্ষণ মুখ ভার করিয়া বসিয়াছিলেন, এখন কর্ণকে পাইয়া তাঁহার উৎসাহ কত!

শেষে দুইজনে মিলিয়া এমন নীচভাবে পাণ্ডবদের কুৎসা করিতে লাগিলেন যে, রাগে অর্জ্জুনের চক্ষু জবাফুলের মত লাল হইয়া উঠিল। কি সর্ব্বনাশ, অর্জ্জুন ক্ষেপিলে কি আর রক্ষা আছে!

তখন চারিদিকেই মহা কোলাহল! এক দল অর্জ্জুনের পক্ষ লইল, আর এক দল কর্ণকে বাহবা দিতে লাগিল। ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি খুবই ভয় পাইলেন। পাছে দুই পুত্র মারামারি করিয়া মরে, সেই ভয়ে কুন্তীদেবী অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। তার পর যুদ্ধ বাধে বাধে, এমন সময় কৃপাচার্য্য কর্ণকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাপু হে, তুমি যে রাজার ছেলের সঙ্গে

যুদ্ধ করিবার জন্য ভারি আস্ফালন করিতেছ, আগে বল ত, তুমি কোন্ রাজার ছেলে ?”

এই কথায় কর্ণের সকল দর্পই চূর্ণ হইল ! তিনি মাথা হেঁট্ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন দুর্য্যোধনের রাগ দেখে কে ! তিনি বলিলেন, “বেশ ! রাজা না হইলে যদি অর্জ্জুন যুদ্ধ না করে, তবে এখনই আমি কর্ণকে রাজা করিয়া দিতেছি।” এই বলিয়া তখনই ব্রাহ্মণ আনাইয়া, ফুল ছড়াইয়া, চামর দোলাইয়া কর্ণকে অঙ্গদেশের রাজা করিয়া দিলেন।

ইহাতে কর্ণের আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি দুর্য্যোধনকে বলিলেন, “বন্ধু, চিরদিনের মত আমি তোমার বাধ্য হইয়া রহিলাম ! যখন যেরূপ আদেশ করিবে, তখন তাহাই করিব।” দুর্য্যোধন বলিলেন, “তোমাকে যখন দলে পাইয়াছি, আর আমার কিসের ভয় ? পাণ্ডবদের আমি গ্রাহ্যই করি না।”

অর্জ্জুনের নিতান্ত ইচ্ছা ছিল, এই বর্ব্বরদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দেন, কিন্তু দ্রোণাচার্য্য কিছুতেই রাজী হইলেন না।

সেদিন সন্ধ্যা হইয়া না পড়িলে ব্যাপার যে কতটা গুরুতর হইয়া উঠিত, তাহা বলা কঠিন। সন্ধ্যা হওয়ায় ঝগড়া-বিবাদ এক রকম থামিয়া গেল।

এইবার গুরুদক্ষিণার কথা। দ্রোণাচার্য্য এখনও পাঞ্চাল-রাজা দ্রুপদের কথা ভুলেন নাই। সে অপমান কি কেহ

সহজে ভুলিতে পারে! আচার্য্য তাঁহার একটি কাজ করিয়া দেবার কথা পূর্ব্বেই কুমারগণকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন। এইবার সেই কাজ করিবার সময় উপস্থিত। দ্রোণ বলিলেন, "বৎসগণ, তোমরা পাঞ্চালরাজ দ্রুপদকে ধরিয়া দাও। ইহাই আমি গুরুদক্ষিণা বলিয়া মনে করিব।"

রাজপুত্রেরা ত তাহাই চান! বিশেষতঃ বাহাদুরী দেখাইবার ইচ্ছা কৌরবদের মনে খুবই প্রবল। আচার্য্যকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তাহারা আগে গিয়া দ্রুপদকে আক্রমণ করিল বটে, কিন্তু শিক্ষিত পাঞ্চাল সৈন্যের হস্তে তাহাদের দুর্দ্দশার অবধি রহিল না। পলায়ন না করিলে সে যাত্রা দুর্য্যোধনের দল রক্ষা পাইত কি না সন্দেহ!

ইহার পর যখন পঞ্চ পাণ্ডব আর দ্রোণাচার্য্য সেখানে উপস্থিত হইলেন, তখন ব্যাপার হইল ঠিক বিপরীত। ভীম, অর্জ্জুনের কি আশ্চর্য্য শক্তি! তাহারা এমন তেজের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন যে, কাহার সাধ্য সেখানে দাঁড়ায়! দেখিতে দেখিতে দ্রুপদের সমস্ত সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। দ্রুপদ প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াও রক্ষা পাইলেন না; অর্জ্জুন তাঁহাকে বন্দী করিয়া গুরুর হাতে অর্পণ করিলেন।

আচার্য্য কিন্তু দ্রুপদের প্রতি যথেষ্ট সদয় ব্যবহার করিলেন। ইচ্ছা করিলেই তিনি সমুদয় পাঞ্চাল-রাজ্য অধিকার করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা না করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "দ্রুপদ, আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম। অর্দ্ধেক

রাজ্য লইয়া তুমি সুখে বাস কর। পাছে আবার আমাকে অবজ্ঞা কর, সেই জন্য বাকি অর্দ্ধেক আমি রাখিলাম।"

দ্রুপদের মুখে কথাটি নাই। দ্রোণ অনুগ্রহ করিয়া যাহা দিলেন, তাহাই যথেষ্ট। দ্রুপদ মুখে প্রফুল্লভাব দেখাইয়া গৃহে ফিরিলেন বটে, কিন্তু মনে মনে ভাবিলেন, 'যে প্রকারেই হউক, এ অপমানের প্রতিশোধ না লইয়া ছাড়িব না।'

এই ঘটনার পর অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে। যুধিষ্ঠির এখন বড় হইয়াছেন। এতদিন ধৃতরাষ্ট্র রাজ্যের কাজ চালাইতেছিলেন; এখন যুধিষ্ঠিরের উপর যাহাতে শাসনের ভার পড়ে, সে জন্য দেশের লোক ব্যস্ত হইয়া উঠিল। অন্ধ-রাজ দেখিলেন, পাণ্ডবদিগকে আর চাপিয়া রাখা অসম্ভব। তখন ভয়ে ভয়ে যুধিষ্ঠিরকে যুবরাজের আসন দিতে বাধ্য হইলেন।

পাণ্ডবদের গুণে যেমন সকলে মোহিত, তাঁহাদের বাহু-বলেও তেমনি সকল শত্রু বশে আসিতে লাগিল। এমন কি, পাণ্ডুও যাহাদিগকে শাসন করিতে পারেন নাই, ভীম, অর্জ্জুনের কাছে তাহাদের মাথাও নীচু হইল। দেশময় পাণ্ডবদের 'জয় জয়' পড়িয়া গেল।

পাণ্ডবদের প্রতি দেশের লোকের শ্রদ্ধা-ভালবাসা দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্র খুবই ভয় পাইলেন। দুর্য্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি রাগে, দুঃখে ও হিংসায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, 'পাণ্ডবদিগকে আর বাড়িতে দিলে রক্ষা নাই।

যে কোন প্রকারে হউক, উহাদিগকে বধ করিতেই হইবে। নচেৎ নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করা কোন মতেই সম্ভব নহে।'

ইহার পর দুষ্ট মন্ত্রিগণকে লইয়া গোপনে পরামর্শ চলিতে লাগিল। শেষে এই ঠিক হইল যে, ধৃতরাষ্ট্র শিবপূজা উপলক্ষ করিয়া পঞ্চ পাণ্ডব আর কুন্তীকে বারণাবত নামক স্থানে পাঠাইয়া দিবেন। মন্ত্রী পুরোচন আগে সেখানে গিয়া চর্বি, ঘি, পাট, শণ, গালা প্রভৃতি দিয়া কৌশলে এমন একখানা বাড়ী প্রস্তুত করিয়া রাখিবে যে, আগুন ছোঁয়াইবামাত্র যেন উহা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। পাণ্ডবেরা বারণাবতে গিয়া এই জতুগৃহেই বাস করিবেন। তারপর সুবিধামত একদিন উহাতে আগুন দিয়া সকলকে পুড়াইয়া মারা হইবে।

পরামর্শ অতি গোপনেই হইয়াছিল। বিদুর কিন্তু সব কথাই জানিতে পারিলেন এবং ধৃতরাষ্ট্রের কৌশলে পাণ্ডবেরা বারণাবত যাইতে প্রস্তুত হইলে, তিনি এই দুষ্ট অভিসন্ধির কথা যুধিষ্ঠিরকে জানাইয়া বিশেষ সতর্ক থাকিতে বলিলেন।

যথাসময়ে পাণ্ডবগণ বারণাবতে পঁহুছিলেন। তাঁহাদিগকে পাইয়া লোকের আনন্দ আর ধরে না। পুরোচন হাসি হাসি মুখে খুব আদর দেখাইয়া সকলকে জতু-গৃহে লইয়া গেল।

এত আদরের কারণ কি, পাণ্ডবদের তাহা জানিতে বাকী ছিল না। কিন্তু তবুও তাঁহারা যেন কিছুই জানেন না, এই ভাবে সেই গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে এক বৎসর কাটিয়া গেল।

এই সময়ের মধ্যে তাঁহারা বিদুর প্রেরিত একজন খনকের দ্বারা গৃহমধ্যে সুড়ঙ্গ প্রস্তুত করাইলেন এবং বন-জঙ্গল ঘুরিয়া চারিদিকের পথ-ঘাট চিনিয়া লইলেন। সুড়ঙ্গটি এমন ভাবে কাটান হইয়াছিল যে, ঘরে আগুন লাগিলে, তাহার ভিতর দিয়া পলাইতে যেন কোন অসুবিধা না হয়।

তার পর চতুর্দ্দশীর ব্রত উপলক্ষে কুন্তীদেবী একদিন রাত্রে কয়েকজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেন। এক নিষাদী ও তাহার পাঁচটি ছেলে প্রসাদ পাইতে আসিয়া, এমন খাওয়াই খাইল যে, উঠিয়া যাওয়া তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইল। সে রাত্রে তাহারা সেই খানেই পড়িয়া রহিল।

পাণ্ডবেরা শুনিয়াছিলেন, পুরোচন সেই রাত্রেই জতুগৃহে আগুন দিবে। সেই জন্য খুব সতর্কভাবে তাহার চাল-চলন লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। ক্রমে রাত গভীর হইয়া আসিল। হু হু শব্দে বাতাস বহিতে লাগিল। তবু পুরোচনের দেখা নাই। তখন ভীমের মাথায় এক খেয়াল চাপিল। পুরোচন জাগিবার পূর্ব্বেই ভীম উঠিয়া সর্ব্বাগ্রে সেই দুষ্টের ঘরে আগুন দিলেন! তার পর একে একে অন্য সব ঘরে আগুন দিয়া জননী ও ভাইগুলিকে লইয়া সুড়ঙ্গ-পথে পলায়ন করিলেন।

দেশশুদ্ধ লোক জাগিয়া 'হায়' 'হায়' করিতে করিতে ছুটিয়া আসিল! কিন্তু ততক্ষণে চারিদিকে এমন ভয়ানক আগুন ধরিয়া উঠিয়াছে যে,' কাহার সাধ্য তাহার নিকটে যায়!

সকাল হইলে ভস্মের মধ্যে নিষাদী আর তাহার পাঁচ পুত্রের কঙ্কাল দেখিয়া লোকে মনে করিল, পঞ্চপাণ্ডব ও কুন্তী পুড়িয়া মরিয়াছেন। দেশময় হাহাকার পড়িয়া গেল। পুরোচন যে মরিয়াছে, তাহাতে কাহারও দুঃখ নাই। লোকে বলাবলি করিতে লাগিল, "হতভাগা যেমন দুষ্ট, তাহার উচিত সাজা পাইয়াছে।"

এই সংবাদ হস্তিনায় পঁহুছিতে বিলম্ব হইল না। অমনি ঘরে ঘরে কান্নার রোল উঠিল। এদিকে দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ প্রভৃতির আনন্দের সীমা নাই! ধৃতরাষ্ট্র মুখে মায়াকান্না কাঁদিলেন বটে, কিন্তু মনে মনে ভাবিলেন, 'আপদ্ চুকিল। আর আমার দুর্য্যোধনের সিংহাসন ছাড়ায় কে!' বিদুর সব কথাই জানিতেন। কিন্তু পাছে লোকে সন্দেহ করে, সেই ভয়ে তিনিও একটু লোক-দেখান কান্না কাঁদিলেন। ইহার পর যথানিয়মে মৃত ব্যক্তিগণের শ্রাদ্ধ শান্তি শেষ হইল।

এদিকে জতুগৃহ হইতে বাহির হইয়া, পাণ্ডবেরা নানা বন-জঙ্গল ভাঙ্গিয়া, সমস্ত রাত দক্ষিণ দিকে চলিতে লাগিলেন। তার পর গঙ্গা পার হইয়া সমস্ত দিনও চলিলেন। ক্রমে ভীম ছাড়া আর সকলেই খুব ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। পিপাসায় তাঁহাদের ছাতি ফাটিতে লাগিল। আর এক পা যে চলিবেন, এমন শক্তি কাহারও নাই। তখন ভীম জননীকে কাঁধে ও নকুল সহদেবকে কোলে লইলেন এবং যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুনের হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

সারাদিনের মধ্যে তাঁহাদের ভাগ্যে একবিন্দু জলও জুটিল না।

পরদিন সন্ধ্যার পর জঙ্গলের মধ্যে সারসের ডাক শুনিয়া ভীম বুঝিলেন, নিকটেই কোথাও জলাশয় আছে। অমনি জননী ও ভাইগুলিকে একটি গাছের নীচে বিশ্রাম করিতে বলিয়া তিনি জলের চেষ্টায় বাহির হইলেন। ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, সকলেই ঘুমে অচেতন। তখন জল রাখিয়া ভীম পাহারা দিতে লাগিলেন।

সেই জঙ্গলে এক রাক্ষস থাকিত, তাহার নাম হিড়িম্ব। পাণ্ডবদের সন্ধান পাইয়া সে তাহার ভগিনী হিড়িম্বাকে বলিল, "বা, কি মজা রে! ছুটে যা, ধ'র্‌বি আর ঘাড় মট্‌কাবি!" দাদার কথায় হিড়িম্বা হন্ হন্ করিয়া ছুটিয়া আসিল বটে, কিন্তু ভীমকে দেখিয়াই সে এমন মোহিত হইয়া গেল যে, ঘাড় মট্‌কাইবার কথা তাহার আর মনেই রহিল না। সুন্দরী স্ত্রীলোকের বেশ ধরিয়া বিবাহের জন্য সে ভীমকে পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিয়া দিল। শুধু তাই নয়, তাহার দাদার হাত হইতে সকলকে রক্ষা করিবার জন্যও প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল।

ভীমের কিন্তু গ্রাহ্যই নাই। তিনি বলিলেন, "আমাদের জন্যে তোর এত মাথা ব্যথা কেন? আসুক্ তোর দাদা, তার পর দেখা যাবে।"

এদিকে রাক্ষসের আর দেরী সহে না। ভগিনীর বিলম্ব দেখিয়া সে রাগে চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া আসিল।

ভীম অনেক ধমক দিলেন, সে কিন্তু কিছুতেই দমিল না। তখন যুদ্ধ ছাড়া আর উপায় কি? সেই ভীষণ যুদ্ধে জঙ্গলের একটি গাছও খাড়া রহিল না। আশ-পাশের বহুদূর পর্য্যন্ত রক্তে লাল হইয়া উঠিল। শেষে ভীম রাক্ষসকে সাপ্‌টিয়া ধরিয়া এমন আছাড় দিলেন যে, সেই এক আছাড়েই তাহার পিঠের দাঁড়া মট্‌ করিয়া ভাঙ্গিয়া গেল।

যুদ্ধের গোলমালে জাগিয়া উঠিয়া সকলে ত অবাক্! হিড়িম্বাকে দেখিয়া এবং তাহার মুখে সকল কথা শুনিয়া কুন্তী ও যুধিষ্ঠির এতই সন্তুষ্ট হইলেন যে, তাহার সহিত ভীমের বিবাহ দিতে মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিলেন না। যথাসময়ে হিড়িম্বার একটি ছেলে হইল, তাহার নাম ঘটোৎকচ; জন্মিবামাত্র সে ভীমকে বলিল, "বাবা, এখন আমি যাই। আপনার যখন যে কোন দরকার হইবে, ডাকিলেই আসিব।"

ইহার পর পাণ্ডবেরা আবার বনে ঘুরিতে লাগিলেন। চারিদিকে দুর্য্যোধনের লোক। ধরা পড়িবার ভয়ে সকলেই তপস্বীর বেশ ধারণ করিলেন। ক্রমে নানা বন, নানা রাজ্য পার হইয়া, ব্যাসদেবের পরামর্শে তাঁহারা একচক্রা নামক নগরে এক ব্রাহ্মণের গৃহে আশ্রয় লইলেন। ব্যাসদেব সম্পর্কে কৌরব ও পাণ্ডবের পিতামহ!

সেখানে পাঁচ ভাই সারাদিন ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেন। সন্ধ্যার পর মায়ের কাছে আসিয়া ভিক্ষার অন্ন দুই ভাগ করিতেন। এক ভাগ ভীমের আর এক ভাগ বাকি সকলের।

একদিন চার ভাই ভিক্ষায় বাহির হইয়াছেন, কেবল কুন্তী ও ভীম বাড়িতে আছেন, এমন সময় ব্রাহ্মণের বাড়ীতে কান্না-গোল উঠিল। কুন্তী ছুটিয়া গিয়া দেখেন—ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী আর তাঁহাদের দুইটি ছেলে-মেয়ে মাটিতে লুটাইয়া কাঁদিতেছেন! কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ব্রাহ্মণ বলিলেন, "মা, এই নগরের কাছেই 'বক' নামে একটা দুর্দ্দান্ত রাক্ষস থাকে। দেশের লোক পালা করিয়া তাহার খাবার যোগায়। সে কি যেমন তেমন খাবার! এক নৌকা ভাত আর এক পাল গরু-মহিষ। রাক্ষস সেই ভাতও খায়, জানোয়ারগুলাও খায় আর যে লোক খাবার লইয়া যায়, তাহাকেও খায়। কাল আমাদের পালা কে খাবার লইয়া যাইবে, সেই কথা ভাবিয়াই আমাদের বুক ফাটিয়া যাইতেছে। খাবার যদি না পাঠাই, রাক্ষস আসিয়া আমাদের সকলকেই খাইয়া ফেলিবে!"

ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া কুন্তী সকলকে সাহস দিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। আমার এক ছেলে কাল রাক্ষসের খাবার লইয়া যাইবে!" ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী কি সহজে সে কথায় কাণ দেন! কুন্তী কিন্তু ছাড়িলেন না; অনেক করিয়া বুঝাইয়া তাঁহাদিগকে রাজী করিলেন।

পরদিন ভোরের বেলা ভীম রাক্ষসের খাবার লইয়া জঙ্গলে প্রবেশ করিলেন। বক যে কিরূপ রাক্ষস, তাহা তিনি জানিতেন না! হঠাৎ সমস্ত বন কাঁপিয়া উঠিল আর এমন ভয়ানক শব্দ হইতে লাগিল যে, ভীম মনে করিলেন, বুঝি বা

সমুদয় আকাশ ফাটিয়া বজ্র পড়িতেছে! ভীম কিন্তু অটল। তিনি এক একবার রাক্ষসকে ডাকেন আর টপাটপ্ তাহার ভাতগুলি মুখে দেন।

বক নিকটে আসিয়া ভীমের কাণ্ড দেখিয়া ক্ষেপিয়া গেল। তার পর হাতের কাছে গাছ-পাথর যাহা পাইল, তাহা লইয়া তাঁহাকে দমাদম্ প্রহার করিতে লাগিল! কিন্তু তাহাতেও ভীমের ভ্রূক্ষেপ নাই। বাকি ভাতগুলি শেষ করিয়া তিনি কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইলেন।

ইহার পর ভয়ানক যুদ্ধ বাধিয়া গেল। ভীমের হুঙ্কারে আর রাক্ষসের গর্জ্জনে দশদিক্ কাঁপিয়া উঠিল। ভীম একটু বাগে পাইলে রাক্ষসকে পিটিয়া তুলো-ধোনা করিতে থাকেন, আবার রাক্ষসও সুযোগ পাইলে প্রতিশোধ লইতে ছাড়ে না! এই ভাবে যুদ্ধ করিতে করিতে হঠাৎ ভীম রাক্ষসের চুলের ঝুঁটি ধরিয়া এমন ঘুরপাক আর সেই সঙ্গে এমন কয়েকটা আছাড় দিলেন যে, রক্তবমি করিতে করিতে তাহার দফা হইয়া গেল!

বকের মৃত্যুতে লোকের ভয় ভাবনা দূর হইয়া গেল। ব্রাহ্মণ প্রচার করিয়া দিলেন, এক মহাপুরুষ তাঁহাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া রাক্ষস বধ করিয়াছেন।

ইহার কিছুদিন পরে এক অতিথি ব্রাহ্মণের নিকট হইতে পাণ্ডবেরা খবর পাইলেন যে, পাঞ্চাল দেশের রাজা দ্রুপদের কন্যা কৃষ্ণার শীঘ্রই স্বয়ংবর হইবে।

আচার্য্য দ্রোণকে অপমান করায়, শেষে দ্রুপদের কিরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছিল, তাহা তোমরা জান। সে দুঃখ তিনি ভুলিতে পারেন নাই। দ্রোণকে মারিবার জন্য তিনি 'পুত্রেষ্টি' যজ্ঞ করিয়া এক পুত্র ও একটি কন্যা লাভ করেন। পুত্রটি ঝক্‌ঝকে রথে চড়িয়া যজ্ঞের অগ্নি হইতে বাহির হইলেন। তাঁহার মাথায় মুকুট, দেহে বর্ম্ম এবং হাতে তীর, ধনু ও তলোয়ার। আর কন্যাটি বাহির হইলেন যজ্ঞের বেদী হইতে। এই কন্যার কথা আর কি বলিব! এমন অপরূপ সুন্দরী দেবতারাও কখনও দেখেন নাই, রং কাল বটে, কিন্তু সেই কাল রংএই ইনি জগৎ আলো করিয়াছিলেন। ইহার উপর কন্যার দেহ হইতে সদ্যঃ প্রস্ফুটিত পদ্মের গন্ধ বাহির হওয়াতে লোকে ইঁহাকে দেখিবার জন্য পাগল হইয়া উঠিত।

কাল ছিলেন বলিয়া কন্যার নাম হইল কৃষ্ণা; কিন্তু দ্রুপদের কন্যা বলিয়া লোকে ইঁহাকে দ্রৌপদী বলিত। আর পুত্রের নাম হইল ধৃষ্টদ্যুম্ন।

স্বয়ংবরের কথা শুনিয়া পাণ্ডবেরা ভাবিলেন, 'একস্থানে অনেকদিন ভালও লাগে না, ভিক্ষাও জুটে না। এই সুযোগে একবার পাঞ্চালে যাইতে পারিলে বেশ হয়।' সেই সময় হঠাৎ ব্যাসদেবের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। তিনিও তাঁহাদিগকে সেখানে যাইতে পরামর্শ দিলেন।

অবশেষে শুভদিন দেখিয়া পাণ্ডবেরা পাঞ্চালে যাত্রা করিলেন। কতক দূর অগ্রসর হইবার পর চিত্ররথ নামে এক

গন্ধর্ব্বের সহিত তাঁহাদের বিরোধ উপস্থিত হইল! যুদ্ধে গন্ধর্ব্ব পরাজিত হইয়া অর্জ্জুনের হস্তে বন্দী হইলেন। ইহাতে গন্ধর্ব্বের স্ত্রী ত কাঁদিয়াই আকুল! শেষে তিনি যুধিষ্ঠিরকে এমন করিয়া ধরিয়া বসিলেন যে, অর্জ্জুন চিত্ররথকে না ছাড়িয়া পারিলেন না।

মুক্তিলাভ করিয়া গন্ধর্ব্ব অর্জ্জুনের উপর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে 'চাক্ষুসী' নামে এক বিদ্যা শিখাইয়া দিলেন। এই বিদ্যার বলে পৃথিবীর যে কোন বস্তু দেখিতে ইচ্ছা হয়, তাহাই দেখা যায়। ইহা ছাড়া একশতটি অতি আশ্চর্য্য ঘোড়াও দিলেন। আর অর্জ্জুনও চিত্ররথকে ব্রহ্মাস্ত্র প্রদান করিলেন।

এই সময়ে উৎকোচক তীর্থে ধৌম্য নামে এক ঋষি বাস করিতেন। তাঁহার মত ভাল লোক সহজে চক্ষে পড়িত না। চিত্ররথের পরামর্শে পাণ্ডবেরা সেখানে গিয়া ধৌম্যকে আপনাদের পুরোহিত করিয়া লইলেন। অসময়ে তাঁহাকে পাইয়া পাণ্ডবদের বড়ই উপকার হইয়াছিল।

তার পর পঞ্চ পাণ্ডব, কুন্তী আর ধৌম্য পাঞ্চালে উপস্থিত হইয়া এক কুম্ভকারের বাড়ীতে আশ্রয় লইলেন।

তাঁহারা দেখিলেন, স্বয়ংবর উপলক্ষে রাজ্যময় মহা ধুমধাম পড়িয়া গিয়াছে। ক্রমাগত পনর দিন ধরিয়া কত ঋষি, মুনি, রাজা রাজপুত্র আর বড় বড় যোদ্ধা যে যেখানে সমবেত হইলেন, কে তাহার সংখ্যা করে! দেবতারা পর্য্যন্ত দল

বাঁধিয়া আসিলেন। এই কয়দিন শুধু নৃত্য, গীত, বাদ্য আর আমোদ প্রমোদেই কাটিয়া গেল।

স্বয়ংবরের দিন উপস্থিত। সকালবেলা যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাঁচ ভাই ব্রাহ্মণের বেশে সভায় আসিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। এমন অপূর্ব্ব সভাগৃহ আর রাজা রাজড়ার এমন বিচিত্র সাজসজ্জা তাঁহারা পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই। ব্রাহ্মণদের মধ্যে বসিয়া তাঁহারা আগ্রহের সহিত দ্রৌপদীর আগমন প্রতিক্ষা করিতে লাগিলেন।

একটা প্রকাণ্ড ধনুকে গুণ পরাইয়া লক্ষ্য বিঁধিতে হইবে। দ্রুপদের নিতান্ত ইচ্ছা, অর্জ্জুনের সহিত কৃষ্ণার বিবাহ হয়। সেই জন্য তিনি এমন একটি ধনু প্রস্তুত করাইয়াছিলেন যে, অর্জ্জুন ছাড়া আর কেহ যেন তাহা উঠাইতে না পারে।

যথাসময়ে দ্রৌপদী সুন্দর বসন-ভূষণে সজ্জিত হইয়া মালা হস্তে, ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত সভায় প্রবেশ করিলেন। অমনি বাদ্যগীত থামিয়া গেল।

তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "আপনারা শূন্যে ঐ যে লক্ষ্য দেখিতেছেন, জলে উহার স্পষ্ট ছায়া পড়িয়াছে। লক্ষ্যের ঠিক নিম্নে একটি চক্র ঘুরিতেছে। ছায়া দেখিয়া যিনি চক্রের ভিতর দিয়া পরে পরে পাঁচটি তীর-দ্বারা লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে পারিবেন, দ্রৌপদী তাঁহারই গলে বরমাল্য দিবেন।"

অমনি চারিদিকে মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। সকলেই অগ্রে গিয়া লক্ষ্য বিঁধিবার জন্য ব্যস্ত! একে একে শাল্ব,

শল্য, শিশুপাল, জরাসন্ধ, দুর্য্যোধন প্রভৃতি রাজারা প্রাণপণে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু লক্ষ্য বিদ্ধ করা দূরে থাক, অনেকে ধনুকটি বাঁকাইতেই পারিলেন না! কেহ কেহ তাহার ভারে কাৎ হইয়া শুইয়া পড়িলেন, কেহ কেহ বা ধনুকের তেজ সহ করিতে না পারিয়া দূরে ঠিক্‌রাইয়া গেলেন! বড় বড় রাজাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া ধনুর নিকটে যাইতে আর কাহারও সাহস হইল না। কর্ণ একবার দম্ভ করিয়া গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু দ্রৌপদী সারথির ছেলের গলায় বরমাল্য দিতে অস্বীকার করায়, তাঁহাকে মাথা নীচু করিয়া ফিরিয়া আসিতে হইল।

পাণ্ডবেরা এতক্ষণ এমন ভাবে লুকাইয়া বসিয়া ছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম ছাড়া আর কেহই তাঁহাদিগকে চিনিতে পারেন নাই। রাজারা ফিরিয়া আসিলে, যুধিষ্ঠিরের ইঙ্গিতে অর্জ্জুন ধনুকের নিকট অগ্রসর হইলেন। তাঁহার এরূপ অসম সাহস দেখিয়া ভয়ে ব্রাহ্মণদের মুখ শুকাইয়া গেল; একজনের দোষে বুঝি বা সকলকেই বিপদে পড়িতে হয়। তাঁহারা বার বার নিষেধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু অর্জ্জুনের গ্রাহ্যই নাই। দেখিতে দেখিতে তিনি সেই বিশাল ধনুতে গুণ পরাইয়া ক্রমে ক্রমে পাঁচটি তীর মারিয়া লক্ষ্য বিদ্ধ করিলেন!

চারিদিকে জয় জয় ধ্বনি পড়িয়া গেল। তূরী, ভেরী, ঢাক, ঢোলের ঘোর নিনাদে আকাশ-পাতাল কাঁপিয়া উঠিল। দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন; কুন্তীদেবী সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণের পিসী হইতেন। অর্জ্জুনের গৌরবে কৃষ্ণ আনন্দে

নাচিয়া উঠিলেন। সেই আনন্দের মধ্যে দ্রৌপদী অগ্রসর হইয়া অর্জ্জুনকে বরমাল্য দিলেন।

এ অপমান ক্ষত্রিয় রাজাদের আর সহ্য হইল না! তাঁহাদের মত এমন সকল যোগ্য পাত্র থাকিতে ব্রাহ্মণে কি না কন্যা লইয়া যাইবে! এত বড় বুকের পাটা! রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে সকলে দল বাঁধিয়া আসিয়া দ্রুপদ আর অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিলেন। এতক্ষণ ভীম চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন! প্রকাণ্ড একটা গাছ উঠাইয়া লইয়া তিনিও বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইলেন।

রাজা মহাশয়েরা স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, ব্যাপারটা এমন গুরুতর হইয়া উঠিতে পারে। শেষে মার খাইতে খাইতে যখন কেহ অস্ত্রহীন, কেহ হস্তহীন, কেহ মুকুটহীন, কেহ বা রথহীন হইয়া পড়িলেন, তখন তাঁহাদের চৈতন্য হইল বটে, কিন্তু ভীম, অর্জ্জুনের হস্ত হইতে তখন আর পলাইবার উপায় রহিল না। তাঁহাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের দয়া হইল। তিনি আসিয়া সব গোলযোগ মিটাইয়া দিলেন।

কুন্তী বাড়ীতেই ছিলেন। সন্ধ্যা হইয়া গেল, তবুও ছেলেরা ফিরিল না। তিনি মনে মনে কত কি ভাবিতেছেন, এমন সময় ভীম, অর্জ্জুন প্রভৃতি কৃষ্ণাকে লইয়া উপস্থিত। তাঁহারা বাহির হইতে ডাকিয়া বলিলেন, "মা আজ কি আশ্চর্য্য জিনিষ পাইয়াছি, দেখ।" কুন্তী কিছু না ভাবিয়া হঠাৎ উত্তর করিলেন, "যাহা আনিয়াছ, তাহা তোমাদের পাঁচ

জনের হউক।” কি সর্ব্বনাশ! এখন উপায়? যুধিষ্ঠির প্রভৃতি বিষম সমস্যায় পড়িয়া গেলেন।

যাহা হউক, শেষে তাঁহারা এই স্থির করিলেন,—বরং পাঁচ জনে মিলিয়া দ্রৌপদীকে বিবাহ করিবেন, তথাপি মাতৃ-আজ্ঞা অমান্য করিবেন না।

এদিকে দ্রৌপদী কাহার হাতে পড়িলেন, ঠিক জানিতে না পারিয়া রাজা দ্রুপদ অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিলেন। যিনি লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছেন, তিনি কি সত্যই ব্রাহ্মণ! আর যুদ্ধের সময় যিনি বৃক্ষহস্তে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিলেন, তিনিই বা কে? ব্রাহ্মণ হইলে দুই জনে কি লক্ষাধিক ক্ষত্রিয় বীরকে এমন ভাবে হটাইতে পারিতেন?

ধৃষ্টদ্যুম্ন অগ্রেই কয়েক জন চর লইয়া কুম্ভকারের বাড়ী পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। সেখানে ব্রাহ্মণের বেশধারী পাঁচ ভাই আর তাঁহাদের মাতাকে দেখিয়া পঞ্চপাণ্ডব ও কুন্তী বলিয়া তাঁহার সন্দেহ হইল। তিনি ফিরিয়া আসিয়া দ্রুপদকে সে কথা বলিলেন।

রাজা পূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন যে, পাণ্ডবেরা জতুগৃহের অগ্নিকাণ্ড হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। তবে কি বিধাতা সত্য সত্যই তাঁহার বাসনা পূর্ণ করিলেন!

পরদিন প্রভাত হইতে না হইতে রাজা দ্রৌপদী প্রভৃতির জন্য লোক-লস্কর, হাতী-ঘোড়া এবং সুন্দর সুন্দর রথ

পাঠাইয়া দিলেন। তার পর সকলে রাজপুরীতে উপস্থিত হইলে, কত রকম আদর-যত্নে যে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন, তাহা বলিয়া বুঝান যায় না। ক্রমে যুধিষ্ঠিরের মুখে পাঁচ ভাই ও তাঁহাদের জননীর প্রকৃত পরিচয় পাইয়া দ্রুপদের সকল উদ্বেগ দূর হইল। তিনি আবেগভরে যুধিষ্ঠির প্রভৃতিকে স্নেহালিঙ্গন করিয়া অর্জ্জুনের সহিত দ্রৌপদীর বিবাহ দিবার আয়োজন করিতে বলিলেন।

তখন যুধিষ্ঠির বলিলেন, "মহারাজ, মাতৃ-আজ্ঞায় দ্রৌপদীকে আমরা পাঁচ জনে মিলিয়া বিবাহ করিব।"

যুধিষ্ঠিরের কথা শুনিয়া সভাশুদ্ধ সকলেই অবাক্। ছিঃ, এমন কথা তিনি মুখে আনিলেন কিরূপে ?

এমন সময় হঠাৎ ব্যাসদেব সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনি কেন বৃথা চিন্তা করিতেছেন ? আপনার দ্রৌপদী পূর্ব্বজন্মে এক মুনির কন্যা ছিলেন। কন্যার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া শিব ইঁহাকে এই বর দিয়াছিলেন যে, ইনি অতি গুণবান্ পঞ্চস্বামীর পত্নী হইবেন। শিবের কথা কি মিথ্যা হইতে পারে ? একদিকে শিবের বর আর একদিকে মাতৃ-আজ্ঞা। কাহার সাধ্য বাধা দেয় ? আপনি অবিলম্বে বিবাহের আয়োজন করুন।"

যথা সময়ে পঞ্চপাণ্ডবের সহিত দ্রৌপদীর বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের যে কিরূপ ঘটা হইয়াছিল, আর দেশ-বিদেশের

কত সাধু তপস্বী, মুনি ঋষি ও রাজা তাঁহাদিগকে আশীর্বাদ করিতে আসিয়াছিলেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না!

এই বিবাহের সংবাদ হস্তিনায় পঁহুছিতে বিলম্ব হইল না। দ্রৌপদী কুরুবংশেই পরিণীতা হইয়াছেন, বিদুরের মুখে এই কথা শুনিয়া অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র প্রথমে খুবই আনন্দিত হইয়াছিলেন; তিনি ভাবিয়াছিলেন, দুর্যোধন লক্ষ্য-বেধ করিয়া দ্রৌপদীকে লাভ করিয়াছেন। কিন্তু আসল ঘটনা জানিতে পারিয়া, তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। হায়! হায়! এত আয়োজন, এত চেষ্টা সমস্তই বিফল হইল! বারণাবতের অত আগুনেও পাণ্ডবেরা ভস্ম হইল না!

ইহার পর পাণ্ডবগণকে মারিবার জন্য আবার গোপনে পরামর্শ চলিতে লাগিল। দুর্যোধন বলিলেন, "রাজ্য ও অর্থের লোভ দেখাইয়া দ্রুপদকে বশ করিতে পারিলে, সহজে আপদ্ চুকিয়া যায়।"

কৌরবদের মাতুল শকুনি বলিলেন, "দ্রৌপদীকে কুমন্ত্রণা দিয়া পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে বিরোধ ঘটাইবার চেষ্টা করা উচিত।"

দুঃশাসন বলিলেন, "ভীমটাকে অগ্রেই শেষ করা দরকার। সে বাঁচিয়া থাকিতে আর রক্ষা নাই।"

কর্ণ বলিলেন, "ছোটবেলা হইতে সেই চেষ্টাই চলিতেছে, কিন্তু কিছুই ত করা গেল না। এখন আমি চাই যুদ্ধ! পাণ্ডবেরা দলে ভারি হইবার পূর্বে, এমন করিয়া তাহাদিগকে

আক্রমণ করিব যে, মাথা লইয়া কাহাকেও আর ফিরিতে হইবে না।”

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, “সাবাস্ কর্ণ, তুমি ঠিক বলিয়াছ। বীরের যোগ্য পরামর্শ বটে! ইহাতে আমার সম্পূর্ণ সম্মতি জানিবে।”

এই মন্ত্রণার কথা শুনিয়া ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর প্রভৃতি আসিয়া একবাক্যে বলিলেন, “তোমরা যে কে কত বড় বীর, স্বয়ংবর-সভাতেই তাহা দেখা গিয়াছে! ভীম, অর্জ্জুনের সহিত আর যুদ্ধে দরকার নাই। এখন এক কাজ কর; এই বিবাহের উপযুক্ত যৌতুক পাঠাইয়া পঞ্চপাণ্ডব, কুন্তী আর দ্রৌপদীকে পরিতুষ্ট কর। তার পর সকলকে এখানে আনাইয়া রাজ্যের ন্যায্য অংশ ভাগ করিয়া দাও। জতুগৃহের কলঙ্কের কথা জানিতে কাহারও আর বাকি নাই! তাহা দূর করিবার এই মহা সুযোগ উপস্থিত।”

এই সকল সৎপরামর্শে ধৃতরাষ্ট্র কি সহজে কাণ দিতে চান! দুর্য্যোধন প্রভৃতি ত সভা হইতে উঠিয়াই গেলেন! শেষে ধৃতরাষ্ট্র ভয় পাইয়া ভীষ্ম, দ্রোণ আর বিদুরের কথাতেই রাজী হইলেন। তিনি বলিলেন, “আচ্ছা, পাণ্ডবেরা অর্দ্ধেক রাজ্য লইয়া খাণ্ডবপ্রস্থে গিয়া বাস করুক্। বিদুর, তুমি আজই তাহাদিগকে আনিতে যাও।”

পাণ্ডবেরা হস্তিনায় উপস্থিত হইলে, ধৃতরাষ্ট্র খুব আদর-যত্ন দেখাইয়া বলিলেন, “বৎস যুধিষ্ঠির খাণ্ডবপ্রস্থে গিয়া

তোমরা অর্দ্ধেক রাজ্য পালন কর। দুর্য্যোধন হইতে দূরে থাকিলে, গোলযোগের কোনই সম্ভাবনা থাকিবে না।” এই বলিয়া তিনি তাঁহাদের খাণ্ডবপ্রস্থে যাইবার সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন। বৃদ্ধের মিষ্ট ব্যবহারে ও সুবিচারে পাণ্ডবেরা বিশেষ মুগ্ধ হইলেন এবং রাজ্যের সকলেই খুব আনন্দিত হইল।

ইহার পর শুভদিন দেখিয়া পাণ্ডবেরা খাণ্ডবপ্রস্থে চলিয়া গেলেন। চারিদিকে উৎসাহ ও আনন্দের যেন স্রোত বহিতে লাগিল। তাঁহাদের অভ্যর্থনার ঘটাই বা কত! দেখিতে দেখিতে সেখানকার শ্রী ফিরিয়া গেল! ক্রমে যুধিষ্ঠিরের এই নূতন রাজধানী হস্তিনা অপেক্ষাও সুন্দর হইয়া উঠিল।

এই সুখের দিনে যে সকল মুনি, ঋষি সর্ব্বদাই পাণ্ডবদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিতেন, তাঁহাদের মধ্যে দেবর্ষি নারদ প্রধান। একদিন নারদ রাজ্যপালন বিষয়ে যুধিষ্ঠিরকে নানা উপদেশ দিয়া শেষে বলিলেন, “দ্রৌপদী-সম্বন্ধে তোমরা এই একটা নিয়ম কর যে, যখন তোমাদের মধ্যে কোন একজন তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিবে, তখন অপর কেহ সেখানে উপস্থিত হইবে না। তাহা হইলে তোমাদের ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া বিবাদের কোনই সম্ভাবনা থাকিবে না। যিনি এই নিয়ম ভঙ্গ করিবেন, তাঁহাকে বার বৎসরের জন্য বনে যাইতে হইবে। দেবর্ষির উপদেশ সকলে মাথা পাতিয়া লইলেন।

ইহার পর একদিন যুধিষ্ঠির আর দ্রৌপদী অস্ত্রাগারে বসিয়া

গল্পস্বল্প করিতেছিলেন, এমন সময় এক ব্রাহ্মণ 'হায়' 'হায়' করিতে করিতে অর্জ্জুনের কাছে ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, "হে বীর, চোরে আমার সমস্ত গরু লইয়া পলাইতেছে। আপনি দয়া করিয়া ইহার উপায় করুন।" অর্জ্জুন দেখিলে, এক-দিকে, ব্রাহ্মণকে সাহায্য করিতে হইলে অস্ত্রাগারে যাওয়া প্রয়োজন, তাহাতে যে নিয়মভঙ্গ হইবে, তাহার শাস্তি বার বৎসর বনবাস; আর অন্যদিকে, সাহায্য না করিলে ব্রাহ্মণের সর্ব্বস্ব যায়! ক্ষত্রবীর বনবাসের ভয়ে আপনার কর্ত্তব্য অবহেলা করিলেন না; অস্ত্রাগার হইতে তীর-ধনু লইয়া তখনই চোরকে উপযুক্ত শাস্তি দিলেন। গরুগুলি ফিরিয়া পাইয়া ব্রাহ্মণ ত মহা খুসী! তিনি আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলে, অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের নিকট গিয়া নিয়মভঙ্গ অপরাধের জন্য বনে যাইবার অনুমতি চাহিলেন।

অর্জ্জুনের কথা শুনিয়া যুধিষ্ঠিরের বুক কাঁপিয়া উঠিল; তিনি কতই বুঝাইলেন, কতই বলিলেন, কিন্তু অর্জ্জুন একেবারে অটল। তিনি বলিলেন, "দাদা, যে কারণেই হউক, আমি যখন নিয়মভঙ্গ করিয়াছি, তখন আমাকে শাস্তি লইতেই হইবে। ভ্রাতৃস্নেহে অন্ধ হইয়া অন্যায়ের প্রশ্রয় দেওয়া কি উচিত?"

যুধিষ্ঠির আর কি বলিবেন, কেবল চোখের জলে ভাসিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন একে একে সকলের কাছে বিদায় এবং দাদার পায়ের ধূলি মাথায় লইয়া বনে চলিয়া গেলেন।

এই বনবাসের সময় অর্জ্জুন পৃথিবীর নানাস্থানে, এমন কি, পাতালেও ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। একদিন কয়েকজন ব্রাহ্মণের সহিত তিনি গঙ্গায় নামিয়া স্নান করিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ নাগরাজ্যের কন্যা উলূপী আসিয়া তাঁহাকে ধরিল। আর কোন রূপে তাহার হাত ছাড়াইতে না পারিয়া, অর্জ্জুন শেষে তাহাকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইলেন। ইহার পর মণিপুরে গিয়া অর্জ্জুন রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করিলেন; তাঁহাদের একটি বীর পুত্র হইল, তাহার নাম বভ্রুবাহন।

মণিপুর হইতে অর্জ্জুন গঙ্গাতীরে পঞ্চতীর্থে গিয়া পাঁচটি শাপ গ্রস্তা অপ্সরাকে উদ্ধার করিলেন। তারপর ঘুরিতে ঘুরিতে প্রভাস-তীর্থে উপস্থিত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া তাঁহাকে দ্বারকায় লইয়া গেলেন।

দ্বারকায় গিয়া কৃষ্ণ ও বলরামের ভগিনী সুভদ্রাকে দেখিয়া অর্জ্জুনের বড়ই ভাল লাগিল। সুভদ্রাও অর্জ্জুনের রূপে গুণে মুগ্ধা হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা, অর্জ্জুনের সহিত সুভদ্রার বিবাহ হয়, কিন্তু বলরাম কিছুতেই তাহাতে রাজী নহেন! তখন অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুক্তি করিয়া সুভদ্রা হরণের সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন।

সুযোগের আর অভাব কি? একদিন সুভদ্রা দেবপূজা উপলক্ষে রৈবতক পর্ব্বতে গিয়াছেন শুনিয়া, চুপি চুপি অর্জ্জুনও সেখানে উপস্থিত। তার পর তাঁহাকে রথে উঠাইয়া ঘোড়া ছুটাইয়া দিতে সে বীরের আর কতক্ষণ! সেকালে ক্ষত্রিয়

রাজারা এই ভাবে কন্যা হরণ করিয়া বিবাহ করা বিশেষ সম্মানের কাজ বলিয়া মনে করিতেন।

এই ব্যাপারে দেশময় মহা সোরগোল পড়িয়া গেল। এ অপমান কে সহ্য করিতে পারে! বলরাম রাগে অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। যদুবংশের বড় বড় বীর এবং তাঁহাদের আত্মীয়বন্ধুগণ অর্জ্জুনকে শাস্তি দিবার জন্য অস্ত্রাদি লইয়া প্রস্তুত হইলেন। শেষে শ্রীকৃষ্ণ অনেক বুঝাইয়া তাঁহাদিগকে শান্ত করিলেন। তারপর সকলে মিলিয়া মহা সমাদরে অর্জ্জুন ও সুভদ্রাকে আনিয়া তাঁহাদের বিবাহ দিলেন।

এই ভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে বনবাসের এগার বৎসর কাটিয়া গেল। শেষ বৎসর অর্জ্জুন কৃষ্ণ ও বলরামের সহিত দ্বারকায় বাস করিয়া যথাসময়ে খাণ্ডবপ্রস্থে ফিরিয়া আসিলেন। অর্জ্জুনের সহিত সুভদ্রাকে পাইয়া সকলে যার পর-নাই সুখী হইলেন।

ইহার পর একদিন শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন যমুনার তীরে বেড়াইতে গিয়াছেন, এমন সময় স্বয়ং অগ্নিদেব ব্রাহ্মণের বেশে আসিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, "সমস্ত খাণ্ডব বনটি আমি খাইতে চাই! তোমরা এ বিষয়ে আমাকে সাহায্য কর।"

এরূপ অদ্ভুত ক্ষুধার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, অগ্নিদেব বলিলেন, "শ্বেতকী রাজার মহাযজ্ঞে আমি বার বৎসর ধরিয়া কেবল ঘি খাইয়াছি। এত বেশী ঘি খাওয়াতে আমার বিকার জন্মিয়াছে। আমি ব্রহ্মার কাছে গিয়াছিলাম; তিনি বলিলেন,

'জীব-জন্তু সমেত সমস্ত খাণ্ডব-বনটি খাইতে পারিলে তোমার উপকার হইবে।' তাঁহার পরামর্শে আমি অনেকবার খাণ্ডব-দহনের চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু এই বনে ইন্দ্রের বন্ধু তক্ষক বাস করেন বলিয়া, ইন্দ্র প্রতিবারই আমার চেষ্টা বিফল করিয়া দিয়াছেন। তাই আজ এ বিষয়ে তোমাদের সাহায্য চাহিতেছি।"

তখন অর্জ্জুন বলিলেন, "উপযুক্ত অস্ত্র পাইলে আমরা আপনাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি।"

এ কথায় অগ্নিদেব 'সুদর্শন' নামে এক চক্র এবং 'কৌমুদকী' নামে এক গদা আনিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দিলেন আর অর্জ্জুনকে দিলেন 'গাণ্ডীব ধনু', 'অক্ষয় তূণ' ও 'কপিধ্বজ রথ'। এই সকল মহা অস্ত্রের গুণের কথা বিশেষ করিয়া আর কি বলিব!

তারপর অগ্নিদেব খাণ্ডব-বন দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন তাঁহাকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। কাহার সাধ্য তাঁহাদের অস্ত্র এড়াইয়া পলায়ন করে! দেখিতে দেখিতে আগুনের দাউ দাউ শব্দে দশদিক্ কাঁপিয়া উঠিল! জীব-জন্তু, রাক্ষস খোক্কস, দৈত্য-দানব ভয়ে ছুটাছুটি করিতে করিতে ভস্ম হইয়া গেল। সেই ভয়ানক আগুনে খাল-বিলের জল পর্য্যন্ত টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিতে লাগিল।

তক্ষকের সাহায্যের জন্য ইন্দ্রদেব স্বয়ং আসিয়া যুদ্ধ

করিতে লাগিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সম্মুখে দাঁড়ান কি সহজ ব্যাপার! ইন্দ্র হারিয়া গেলেন, তথাপি উভয়ের বীরত্বে সন্তুষ্ট হইয়া বর দিতে চাহিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "আমাকে এই বর দিন, যেন অর্জ্জুনের সহিত কখনও আমার অপ্রণয় না হয়।"

ইন্দ্র "তথাস্তু" বলিয়া অর্জ্জুনের দিকে চাহিলেন। অর্জ্জুন বলিলেন, "আমাকে আপনার দিব্যাস্ত্র প্রদান করুন।"

অর্জ্জুনের প্রার্থনা শুনিয়া ইন্দ্র বলিলেন, "তুমি তপস্যা দ্বারা মহাদেবকে সন্তুষ্ট কর। তাহা হইলেই আমার সমস্ত অস্ত্র পাইবে।" এই বলিয়া ইন্দ্র সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

সেই ভীষণ আগুন ঠিক পনর দিন ধরিয়া জ্বলিয়াছিল। ইন্দ্রের কৃপায় তক্ষকের পুত্র অশ্বসেন রক্ষা পাইল। আর 'ময়' নামক একটা দানব অনেক কাকুতি-মিনতি করায় অর্জ্জুন তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন।

সভাপর্ব্ব

অগ্নিকাণ্ড হইতে রক্ষা পাইয়া ময় অর্জ্জুনের কাছে হাতযোড় করিয়া বলিল, "আপনি দয়া করিয়া আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছেন। এখন বলুন, কি করিলে আমি আপনার একটু উপকার করিতে পারি?"

অর্জ্জুন বলিলেন, "তোমার এই কথাতেই আমি খুসী হইয়াছি। তুমি শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা কর। তাঁহার কোন কাজ করিয়া দিলে আমি আরও বেশী সুখী হইব।"

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "তুমি যুধিষ্ঠিরের জন্য এমন আশ্চর্য্য এক রাজসভা নির্ম্মাণ করিয়া দাও যে, তাহা দেখিবার লোভে দেবতারাও যেন ছুটিয়া আসেন।"

এই ময় অতি অসাধারণ কারিকর ছিল। দেবতাদের মধ্যে যেমন বিশ্বকর্ম্মা, দানবদের মধ্যে তেমনই ময়। বহুকাল পূর্ব্বে বৃষপর্ব্বা নামে দৈত্যদের এক রাজা ছিলেন। তাঁহার যজ্ঞের জন্য ময় কৈলাস পর্ব্বতের উপর এক অপূর্ব্ব রাজসভা নির্ম্মাণ করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের কথায় এখন সে যুধিষ্ঠিরের সভার জন্য সেখান হইতে মণি-মুক্তা প্রভৃতি নানা উপকরণ সংগ্রহ করিয়া আনিল। আর বিন্দু সরোবর হইতে বৃষপর্ব্বার সোনার গদা এবং বরুণের দেবদত্ত শঙ্খ আনিয়া ভীম ও অর্জ্জুনকে দিল।

ময়ের ন্যায় পাকা কারিকরের হাতে যুধিষ্ঠিরের সভাগৃহটি দেখিতে দেখিতে যে কিরূপ সুন্দর হইয়া উঠিল, তাহা বলিয়া বুঝান যায় না। এই প্রকাণ্ড গৃহের প্রত্যেকখানি ইট, প্রতি কড়ি, বরগা, দরজা-জানালা, সার্সী-খড়্‌খড়ি মণি-মুক্তা আর স্ফটিকে তৈয়ারী। সিঁড়ি, থাম, কার্ণিস্ প্রভৃতিতেও রত্নের ছড়াছড়ি।

সভার চারিদিকেই বাগান। সেখানে কত সুন্দর সুন্দর গাছ। গাছগুলি সমস্তই রূপার; তাহাদের পাতাগুলি সোনার আর ফলগুলি হীরার। মাঝে মাঝে সরোবর। তাহাতে যে সকল পদ্ম ফুটিয়াছে, সেগুলি ঠিক চুণি ও পান্নার মত উজ্জ্বল; যে সকল হংস খেলা করিতেছে, সেগুলি ইন্দ্রধনুর বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত! অধিক আর কি বলিব, এমন সুন্দর, এমন চাকচিক্যময়, এমন জমকাল রাজসভা পৃথিবীতে ত দূরের কথা, স্বর্গেও কেহ কখনও দেখে নাই।

সভা দেখিয়া শুধু যে পাণ্ডবেরাই বিস্মিত হইলেন, তাহা নহে; মুনি, ঋষি, দেবতা, গন্ধর্ব্ব সকলেই অবাক্! একদিন দেবর্ষি নারদ সভায় বিস্তর প্রশংসা করিয়া শেষে যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন; "বৎস, এবার স্বর্গ হইতে আসিবার সময় মহারাজ পাণ্ডুর সহিত আমার দেখা হইয়াছিল। তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা যে, তুমি 'রাজসূয়' যজ্ঞ কর।"

নারদের কথা শুনিয়া যুধিষ্ঠিরের উৎসাহের আর সীমা নাই। কিন্তু রাজসূয় বড় সহজ যজ্ঞ নয়। পৃথিবীর সকল

রাজার নিকট হইতে কর আদায় করিয়া এই যজ্ঞ করিতে হয়। কেহ বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে তাঁহাকে যুদ্ধে হারাইয়া কর আদায় করিতে হয়।

যুধিষ্ঠিরের সহায়-সম্পদের অভাব ছিল না। এ কার্যে সকলেই তাঁহাকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন, কিন্তু কৃষ্ণের পরামর্শ ভিন্ন এরূপ কঠিন যজ্ঞে হাত দিতে তাঁহার সাহস হইল না।

যথাসময়ে শ্রীকৃষ্ণকে আনিবার জন্য দ্বারকায় দূত পাঠান হইল। কৃষ্ণ আসিয়া যুধিষ্ঠিরের কথা শুনিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনার ন্যায় এমন যাঁহার খ্যাতি-প্রতিপত্তি, এমন যাঁহার সহায়-সম্পদ, এমন যাঁহার রাজসভা, রাজসূয়ই তাঁহার উপযুক্ত যজ্ঞ। কিন্তু একটা কথা—মগধের রাজা জরাসন্ধকে আগে শাসন করিতে না পারিলে এ কাজ হইয়া উঠা দায়। লোকটার অসাধারণ শক্তি! দুরন্ত শিশুপালকে সেনাপতি করিয়া ক্ষত্রিয় রাজাদের উপর সেই দুর্বৃত্ত যে কি অত্যাচার করিতেছে, তাহা বলিবার নয়! আপনি শুনিয়া দুঃখিত হইবেন জরাসন্ধ যজ্ঞ করিবার ইচ্ছায় ছিয়াশী জন বড় বড় রাজাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে! আর চৌদ্দ জনকে ধরিতে পারিলেই হতভাগা এক শত রাজাকে এক সঙ্গে বলি দিবে! কি ভয়ানক কথা! ইহার ভয়ে দেশ ছাড়িয়া পলাইয়াও লোকের শান্তি নাই।

সেই দুরাত্মাকে বধ করিয়া বন্দী রাজাদিগকে ছাড়িয়া

দিতে পারিলে, আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হইতে বিলম্ব হইবে না। “এক জরাসন্ধ-জয়ে পৃথিবী-জয়ের কাজ হইবে।”

জরাসন্ধের বল-বিক্রমের কথা শুনিয়া যুধিষ্ঠির নিতান্তই ভীত হইলেন। কিন্তু কৃষ্ণ তাঁহাকে সাহস দিয়া বলিলেন, “ভীম অর্জ্জুন আর আমি এক সঙ্গে গিয়া তাহার দর্প চূর্ণ করিব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।”

মগধের রাজধানীর নাম গিরিব্রজ। পাঁচটি উচ্চ পর্ব্বতের দ্বারা সেই নগর পরিবেষ্টিত। সহসা সৈন্য লইয়া সে দেশ জয় করা অসম্ভব। কাজে কাজেই শ্রীকৃষ্ণ, ভীম ও অর্জ্জুন ব্রাহ্মণের বেশে কোশল, মিথিলা, মালয় প্রভৃতি রাজ্য পার হইয়া গিরিব্রজে উপস্থিত হইলেন। রাজবাটীর সম্মুখেই একটি জয়স্তম্ভ ও তিনটি দুন্দুভি ছিল; তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে সেই গুলি চুরমার করিয়া ফেলিলেন। নগরের লোক ভয়ে একটি কথাও বলিল না।

জরাসন্ধ সে সময় যজ্ঞে বসিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি সেখানে উপস্থিত হইলে, মগধরাজ তাঁহাদিগকে সত্যসত্যই ব্রাহ্মণ ভাবিয়া খুব আদর-যত্ন করিলেন।

তখন কৃষ্ণ বলিলেন, “জরাসন্ধ, এত আদরের কোন প্রয়োজন নাই। আমরা শত্রুভাবে আসিয়াছি, এখনই তোমার দর্প চূর্ণ করিব।

এ কথায় জরাসন্ধ বিশেষ আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমি আপনাদের শত্রু হইলাম কিসে?” শ্রীকৃষ্ণ

বলিলেন, শুধু আমাদের নহে, পৃথিবীর যেখানে যে কোন ক্ষত্রিয় আছে, তুমি তাহাদের সকলেরই শত্রু। ব্রাহ্মণের বেশে আসিয়াছি বটে, কিন্তু আমরা ক্ষত্রিয়। আমি দ্বারকার কৃষ্ণ, আর ইহারা হস্তিনার রাজপুত্র—ভীম ও অর্জ্জুন। তুমি যে সকল নিরীহ রাজাদিগকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছ, হয়, তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দাও; না হয়, এখনই আমাদের সহিত যুদ্ধ কর।"

কৃষ্ণের কথায় জরাসন্ধ রাগে আগুন হইয়া বলিলেন, "কি, আমার বাড়ীতে আসিয়া এত সাহস! এখনই তোমাদের যুদ্ধের সাধ মিটাইব। এস ভীম, অগ্রে তোমাকেই পরীক্ষা করি।"

ভীম ত সর্ব্বদাই প্রস্তুত। ইহার পর দুই বীরে তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া গেল। উভয়ের পায়ের দাপে আর হুঙ্কারে আকাশ-পাতাল কাঁপিয়া উঠিল! নিঃশ্বাসের ঝড়ে বড় বড় গাছ-পালা উড়িয়া যাইতে লাগিল! এই ভাবে তের দিন যুদ্ধ চলিল!

জরাসন্ধের জন্মের কথা অতি অদ্ভুত। তিনি দুই মায়ের পেটে আধ আধখানা করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 'জরা' নামে এক রাক্ষসী সেই দুইভাগ একত্র করিবামাত্র, শিশু চিৎকার করিয়া উঠিল। জরা তাঁহাকে যুড়িয়াছিল বলিয়া তাঁহার নাম 'জরাসন্ধ'! এ সকল রহস্য শ্রীকৃষ্ণ জানিতেন।

তের দিন যুদ্ধের পর জরাসন্ধ বেশ একটু কাবু হইয়াছেন দেখিয়া কৃষ্ণ ভীমকে সঙ্কেত করিলেন! ভীম অমনি দুইখানা

পা ধরিয়া এক টানে তাঁহাকে চিরিয়া ফেলিলেন। তখন সকলের কি আনন্দ!

বন্দী রাজাগণ ঠিক যেন যমের গ্রাস হইতে রক্ষা পাইলেন। উল্লাসে নৃত্য করিতে করিতে তাঁহারা তখন শ্রীকৃষ্ণ ও ভীমার্জ্জুনের স্তুতিগান আরম্ভ করিলেন। শেষে যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া সকলে আপন আপন দেশে চলিয়া গেলেন।

জরাসন্ধের সহদেব নামে এক পুত্র ছিল। তাঁহাকে মগধের সিংহাসনে বসাইয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরিয়া আসিলেন।

ইহার পর যজ্ঞের আয়োজন হইতে লাগিল। সর্ব্বাগ্রে ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব অসংখ্য সৈন্য লইয়া দিগ্বিজয়ে বাহির হইলেন। যথাকালে ভীম পাঞ্চাল, কোশল, অযোধ্যা প্রভৃতি; অর্জ্জুন কুলিন্দ, কালকূট, প্রাগ্জ্যোতিষ প্রভৃতি; নকুল শিবি, মদ্র, ত্রিগর্ত্ত প্রভৃতি এবং সহদেব কলিঙ্গ, দ্রাবিড়, কিষ্কিন্ধ্যা প্রভৃতি সমস্ত রাজ্য জয় করিয়া যজ্ঞের জন্য কর এবং নানাবিধ উপকরণ লইয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন।

এদিকে দেখিতে দেখিতে মুনি-ঋষি, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, রাজ-রাজড়ায় যজ্ঞস্থল পূর্ণ হইয়া উঠিল। ক্রমে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুর প্রভৃতি গুরুজনগণ এবং দুর্য্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি আত্মীয়-স্বজন সকলেই উপস্থিত হইলেন।

এই মহাযজ্ঞ যাহাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, সেজন্য এক

একজনের উপর এক একটা বিশেষ কার্য্যের ভার অর্পিত হইল। দুর্য্যোধন উপহারের বস্তু গ্রহণ করিবেন; দুঃশাসন খাদ্যাদি বিতরণ করিবেন; কৃপাচার্য্য ধন রত্নের তত্ত্বাবধান করিবেন; দ্রোণের পুত্র অশ্বত্থামা ব্রাহ্মণগণকে এবং মন্ত্রী সঞ্জয় রাজাদিগকে আদর-যত্ন করিবেন; ভীষ্ম, দ্রোণ সকল বিষয়েই কর্ত্তা হইয়া থাকিবেন আর শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণগণের পা ধোয়াইবার ব্যবস্থা করিবেন।

যজ্ঞ আরম্ভ হইল। পূজা-অর্চ্চনার পর যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণ ও গণ্য ব্যক্তিদিগকে এক একটি অর্ঘ্য দিয়া পরিতুষ্ট করিলেন। তখন ভীষ্ম বলিলেন, "উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাঁহাকে একটি বিশেষ অর্ঘ্য আনিয়া দাও। এই ভাগ্যবান্ পুরুষটি কে, তাহা লইয়া কিছুক্ষণ আলোচনা হইলে পর ভীষ্ম বলিলেন, "শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা বড় ও মান্য ব্যক্তি এখানে আর কেহই নাই।" ভীষ্মের কথায় সহদেব একটি বিশেষ অর্ঘ্য আনিয়া কৃষ্ণের হাতে দিয়া কৃতার্থ হইলেন।

ইহাতে চেদিরাজ শিশুপাল রাগে আগুন হইয়া শ্রীকৃষ্ণ, ভীষ্ম আর যুধিষ্ঠিরকে অতি নীচভাবে গালাগালি করিতে লাগিলেন। শুধু তাই নয়, আর কয়েকটি দুষ্ট রাজার সহিত দল পাকাইয়া, তিনি যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ পণ্ড করিবার চেষ্টা করিতেও লজ্জিত হইলেন না।

ভীষ্ম কতই বুঝাইলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার চৈতন্য হইল না। গালাগালি করিতে করিতে ক্রমে শিশুপাল

কৃষ্ণকে এরূপভাবে অপমান করিতে লাগিলেন যে, সহদেবের ন্যায় ধীর শান্ত ব্যক্তিরও তাহা অসহ্য বোধ হইল। সহদেব বলিয়া উঠিলেন, "যে দুরাচার শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করে, তাহার মস্তকে আমি পদাঘাত করি।"

এ কথায় শিশুপালের দল একেবারে ক্ষেপিয়া গেলেন। তাঁহাদের বিকট হুঙ্কারে যজ্ঞক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হইবার উপক্রম হইল।

শ্রীকৃষ্ণ এতক্ষণ চুপ করিয়াছিলেন; পাছে যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞের কোন ব্যাঘাত ঘটে, সেই ভয়ে সকল অপমান নীরবে সহ্য করিতেছিলেন। শেষে তাঁহারও ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। তিনি উপস্থিত রাজাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "শিশুপালের ব্যবহার আপনারা স্বচক্ষে দেখিলেন! ইহার মায়ের কাছে আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, 'এই দুষ্টের শত অপরাধ মার্জ্জনা করিব!' অপরাধের সংখ্যা তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী হইয়াছে, আজ আর ইহার রক্ষা নাই!"

এই কথায় শিশুপাল ভীত না হইয়া বরং গালাগালির মাত্রা আরও বাড়াইয়া তুলিলেন।

তখন শ্রীকৃষ্ণের কি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি! সুদর্শন-চক্রের উজ্জ্বল প্রভায় সকলের চক্ষু ঝল্‌সিয়া গেল! দেখিতে দেখিতে শিশুপালের মস্তক মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। যাঁহারা দল পাকাইয়াছিলেন, ব্যাপার দেখিয়া ভয়ে ঠক্-ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন।

ইহার পর যজ্ঞের অবশিষ্ট কার্য্য নির্বিঘ্নে শেষ হইয়া গেল। ক্রমে সকলেই আপন আপন দেশে চলিয়া গেলেন, কেবল দুর্য্যোধন আর শকুনি আরও কিছুদিন ইন্দ্রপ্রস্থে রহিলেন। রাজসভাটি ভাল করিয়া দেখাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য; কিন্তু সভার ভিতর ঘুরিতে ফিরিতে গিয়া দুর্য্যোধন নাকালের চূড়ান্ত হইলেন। কখনও দরজাভ্রমে স্ফটিকের দেওয়ালে মাথা ঠুকিয়া, কখনও স্ফটিকভ্রমে জলে পড়িয়া, কখনও জলভ্রমে স্ফটিকের উপর আছাড় খাইয়া তিনি একেবারে নাস্তানাবুদ!

পাণ্ডবদের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া দুর্য্যোধন একেই হিংসায় ফাটিয়া মরিতেছিলেন, এখন আবার রাজসভার গোলকধাঁধার মধ্যে পড়িয়া রাগে ফুলিতে লাগিলেন। হস্তিনায় ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার একমাত্র চিন্তা হইল, যেরূপেই হউক পাণ্ডবদের সর্ব্বস্ব গ্রাস করিতে হইবে।

শকুনি পরামর্শ দিলেন, "এক কাজ কর। তোমার বাবাকে বলিয়া যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলায় ডাক। কপট পাশায় হারাইয়া তাহার রাজ্যধন সব অধিকার করা যাইবে।"

পাণ্ডবদের শ্রীবৃদ্ধিতে ধৃতরাষ্ট্র মনে মনে খুবই দুঃখিত ছিলেন বটে, কিন্তু তথাপি এত বড় একটা অন্যায় কাজে হঠাৎ মত দিতে পারিলেন না। এ বিষয়ে বিদুরও তাঁহাকে বার বার নিষেধ করিতে লাগিলেন।

কিন্তু শেষে দুর্য্যোধনের ইচ্ছাই পূর্ণ হইল। অন্ধরাজ

পুত্রস্নেহে ভুলিয়া পাণ্ডবদের সর্ব্বনাশের আয়োজন করিলেন। পাশা খেলার জন্য খুব জমকাল এক সভাগৃহ প্রস্তুত করাইয়া তিনি বিদুরের দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

পাশা খেলায় যুধিষ্ঠিরের খুব সখ ছিল বটে, কিন্তু তিনি ভালরূপ খেলিতে পারিতেন না। তাহা হইলে কি হয়, ধৃতরাষ্ট্র যখন ডাকিয়াছেন, তখন ত আর 'না' বলা যায় না; কাজে কাজেই যুধিষ্ঠির, কুন্তী, দ্রৌপদী এবং ভীম, অর্জ্জুন প্রভৃতি চারি ভাইকে লইয়া হস্তিনায় পাশা খেলিতে আসিলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে খেলা আরম্ভ হইল। এক পক্ষে রাজা যুধিষ্ঠির, অপর পক্ষে দুর্য্যোধন; কিন্তু দুর্য্যোধনের হইয়া খেলিতে লাগিলেন শকুনি।

শকুনির মত এমন নীচ প্রকৃতির লোক প্রায় দেখা যাইত না। গুণের মধ্যে তিনি খুব পাশা খেলিতে পারিতেন। বিশেষতঃ কপট-পাশায় তাঁহার ন্যায় ওস্তাদ্ আর ছিল না বলিলেই হয়।

যুধিষ্ঠির সরল মনেই খেলিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু খেলা আরম্ভ হইবার পর দুর্য্যোধনের কু-অভিসন্ধি বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। অথচ তখন তিনি নিরুপায়।

এই খেলাতেই পাণ্ডবদের সর্ব্বনাশ হইল। শকুনির চালে যুধিষ্ঠির দিশাহারা হইয়া একে একে দাস-দাসী, ধন-দৌলত, রাজ্য-সম্পদ্ সমস্তই হারাইলেন, তথাপি চৈতন্য

নাই। পুনরায় পণ রাখিয়া চারি ভাইকে ও নিজেকে হারাইলেন। শেষে দ্রৌপদীকে পর্য্যন্ত বাজি রাখিয়া খেলায় হারিয়া গেলেন। কি সর্ব্বনাশ!

যতক্ষণ খেলা চলিতেছিল, ধৃতরাষ্ট্র আগ্রহের সহিত ফলাফল জিজ্ঞাসা করিয়া পুত্রের জয়ে মনে মনে আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন। শেষে এই অন্ধ বৃদ্ধটিও মনের কু ভাব চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না; যুধিষ্ঠিরকে পথের ভিখারী হইতে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন। দুঃখে ও লজ্জায় ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর প্রভৃতির মুখ লাল হইয়া উঠিল।

ইহার পর কুরু-সভায় যে বীভৎস কাণ্ডের অভিনয় চলিতে লাগিল, তাহা বিশেষ করিয়া না বলাই ভাল! দুর্য্যোধনের আদেশে দুঃশাসন দ্রৌপদীকে 'দাসী' 'দাসী' বলিয়া টানিতে টানিতে রাজসভায় লইয়া আসিলেন এবং গুরুজনদিগের সাক্ষাতেই এমন জঘন্যভাবে তাঁহাকে অপমান করিতে লাগিলেন যে, তাহা মনে করিতেও ঘৃণাবোধ হয়! সেখানে ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি সকলেই উপস্থিত ছিলেন। দ্রৌপদী তাঁহাদের চরণে কতই না বেদনা জানাইলেন, যাতনায় অস্থির হইয়া কতই না কাঁদিলেন, কিন্তু কাহারও এমন সাহস হইল না যে, দুর্য্যোধনের বিরুদ্ধে একটি কথা বলেন অথবা দুঃশাসনের এই পশুবৎ আচরণে বাধা দেন। সেদিন শ্রীকৃষ্ণের সহায়তা ভিন্ন দ্রৌপদীর লজ্জা-সম্ভ্রম রক্ষা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল।

রাগে, দুঃখে ও অপমানে ভীম আর অর্জ্জুন উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠিলেন। একবার যুধিষ্ঠিরের আদেশ পাইলে তাঁহারা এই কৌরব বর্ব্বরগণকে সমূলে বিনাশ করিতে পারেন! কিন্তু ধর্ম্মশীল যুধিষ্ঠির কিরূপে সে আদেশ দেন!

এদিকে পাঁচ ভাইকে জড়ের ন্যায় চুপ্ করিয়া থাকিতে দেখিয়া দুর্য্যোধনের সাহস আরও বাড়িয়া গেল। ইতরের ন্যায় পা উঠাইয়া দ্রৌপদীকে অপমান করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হইলেন না! আর কর্ণ না বলিলেন, এমন কু-কথাই নাই!

তখন ভীম আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। আকাশ-পাতাল কাঁপাইয়া বজ্রগম্ভীরস্বরে বলিলেন, "আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, এই নীচাত্মা দুঃশাসনের বুক চিরিয়া রক্তপান করিব! আর গদার আঘাতে উরু ভাঙ্গিয়া এই নরাধম দুর্য্যোধনকে যমালয়ে পাঠাইব! যদি না পারি, আমার স্বর্গের পথ যেন বন্ধ হয়!"

রাজসভা কাঁপিয়া উঠিল! ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর প্রভৃতি বিষম অনর্থের আশঙ্কা করিতে লাগিলেন! ভীমের প্রতিজ্ঞা— বড় সহজ কথা নহে! এ প্রতিজ্ঞা যে ভীম অক্ষরে অক্ষরে পালন করিবেন, ইহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

ধৃতরাষ্ট্র অন্তঃপুরে থাকিয়াই দ্রৌপদীর ক্রন্দন শুনিতে-ছিলেন। সেই কাতর চীৎকারে পাষাণও গলিয়া যায়, তবু তাঁহার কঠিন হৃদয়ে একটুও দয়ার সঞ্চার হইল না! কিন্তু সে কাতর ধ্বনি গান্ধারী ও বিদুরকে আকুল করিয়া তুলিল!

দেবী গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "মহারাজ, দুরাচার পুত্রেরা সতীর অপমান করিতেছে, আর আপনি পাষাণের মত নিশ্চল নীরব হইয়া আছেন!" ধৃতরাষ্ট্র নির্ব্বাক!

সেই সময় হঠাৎ রাজগৃহে নানা অমঙ্গলের লক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল। তখন অন্ধরাজ ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে দ্রৌপদীকে কাছে আনাইয়া অনেক সান্ত্বনা দিলেন এবং তাঁহার প্রার্থনামত পাণ্ডবদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমি সমস্ত পণ হইতে তোমাদিগকে মুক্তি দিলাম। তোমাদের রাজ্য ধন সবই আবার ফিরিয়া পাইলে! এখন ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়া সুখে রাজত্ব কর।" যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সকলে সন্তুষ্টচিত্তে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

দুর্য্যোধনের হিংসানল কিন্তু তখনও প্রবলভাবে জ্বলিতেছিল। এত সহজে পাণ্ডবেরা পুনরায় রাজ্য পাইবে, ইহা কি সহ্য হয়! ক্রূরমতি ধৃতরাষ্ট্রের মত ফিরাইতে তাঁহার বিশেষ কষ্ট পাইতে হইল না।

পুনরায় পাশাখেলার আয়োজন হইল। গান্ধারী, বিদুর প্রভৃতি শতবার নিষেধ করিলেন, শত ধিক্কার দিলেন, কিন্তু কিছুতেই ধৃতরাষ্ট্রের সুবুদ্ধি হইল না!

পাণ্ডবেরা ইন্দ্রপ্রস্থে পঁহুছিবার পূর্ব্বেই দূত গিয়া আবার সকলকে ডাকিয়া আনিল। এবার খেলার পণ—তের বৎসর বনবাস। শেষ বৎসর অজ্ঞাতবাসের কথা থাকিল। সে

সময় যদি সন্ধান পাওয়া যায়, তবে পুনরায় বার বৎসরের জন্য বনবাস।

শকুনির চক্রান্তে যুধিষ্ঠির আবার হারিলেন। রাজ-সম্পদ্ ছাড়িয়া সকলকে এবার পথের ভিখারী হইতে হইল! তাহাতেও তত কষ্ট নাই, যত কষ্ট দুরাত্মা কৌরবগণের পশুবৎ বিদ্রূপে! তাহাদের রূঢ় বাক্য ও নীচ আকার ইঙ্গিত পাণ্ডবদের হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করিতে লাগিল। ইহাতে দুর্য্যোধন যত খুসী, ততোধিক খুসী দুঃশাসন কর্ণ আর শকুনি।

ভীম আর সহ্য করিতে পারিলেন না। চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া তিনি আবার বলিলেন, "এ অপমানের প্রতিশোধ আমি নিশ্চিতই লইব! যুদ্ধস্থলে দুর্য্যোধনের মস্তকে পদাঘাত করিব, গদার আঘাতে উরু ভাঙ্গিয়া তাহাকে যমালয়ে পাঠাইব আর দুঃশাসনের বুক চিরিয়া রক্তপান করিব।"

অর্জ্জুন বলিলেন, "আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, নীচাত্মা কর্ণকে স্বহস্তে বধ করিব। হিমাচল নড়িলেও, চন্দ্র-সূর্য্য নিভিলেও আমার প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হইবে না!"

সহদেব বলিলেন, "আমি এই কুলাঙ্গার শকুনিকে বধ করিয়া পৃথিবীর কলঙ্ক ঘুচাইব!"

নকুল বলিলেন, "যাহারা এই সকল দুর্ব্বৃত্তদের সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবে, তাহাদের প্রত্যেককে যমালয়ে না পাঠাইয়া আমরা ক্ষান্ত হইব না।"

ভয়ে ধৃতরাষ্ট্র কাঁপিতে লাগিলেন। তাঁহাকে শিরে করা-

ঘাত করিতে দেখিয়া বিদুর বলিলেন, "মহারাজ, এখন আর দুঃখ করিয়া লাভ কি? যে সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইয়াছে, কাহারও সাধ্য নাই, তাহার হস্ত হইতে কুরুকুল রক্ষা করে।"

জননী কুন্তীকে বিদুরের গৃহে রাখিয়া পাণ্ডবেরা যখন হস্তিনা হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন, তখনকার মর্ম্মান্তিক হাহাকারে বুঝি বা পাষাণেও ধারা বহিয়াছিল! রাজ্যময় শুধুই শোকের উচ্ছ্বাস! লোকে 'হায়' 'হায়' করিতে করিতে পথে আসিয়া দাঁড়াইল!

পুরোহিত ধৌম্য পাণ্ডবদিগকে সান্ত্বনা দিতে দিতে বনবাস যাত্রা করিলেন! দুঃশাসনের টানে দ্রৌপদীর বেণী খুলিয়া গিয়াছিল, তিনি সেই অবস্থাতেই চলিলেন! দ্রৌপদী প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যতদিন না দুষ্ট কৌরবগণ পাপের উপযুক্ত শাস্তি পায়, ততদিন তিনি বেণী বাঁধিবেন না।

পাণ্ডবেরা হস্তিনার বাহির হইতে না হইতে হঠাৎ রাজ-সভায় দেবর্ষি নারদ আসিয়া উপস্থিত। তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, "কৌরবদিগের পাপের ভরা পূর্ণ হইয়াছে। তের বৎসর পরে ভীম ও অর্জ্জুনের হস্তে তাহাদের সকলকেই যমালয়ে যাইতে হইবে।"

নারদের বাক্যে অন্ধরাজের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল!

বনপর্ব্ব

হস্তিনা হইতে বাহির হইয়া পাণ্ডবেরা দেখিলেন, বহু ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে বনে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। যুধিষ্ঠির কত নিষেধ করিলেন, কত অনুনয়-বিনয় করিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণেরা কিছুতেই তাঁহাদের সঙ্গ ছাড়িতে রাজী হইলেন না। তাঁহারা বলিলেন, "আমরা আপনাদের সঙ্গে থাকিয়া বরং ভিক্ষা করিয়া খাইব, তথাপি দুর্য্যোধনের পাপরাজ্যে আর বাস করিব না।"

এই কথায় যুধিষ্ঠির মনে মনে আনন্দ অনুভব করিলেন বটে, কিন্তু বনবাসে গিয়া এতগুলি লোককে কি খাইতে দিবেন, এই চিন্তায় অস্থির হইয়া পড়িলেন।

তখন পুরোহিত ধৌম্য বলিলেন, "মহারাজ, আপনি সূর্য্যের পূজা করুন। তাঁহার কৃপায় সকল বিপদ্ কাটিয়া যাইবে।"

যুধিষ্ঠির পুরোহিতের উপদেশ মত সূর্য্যের পূজা করিলেন, সূর্য্যদেব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে একখানি থালী আনিয়া দিয়া বলিলেন, "মহারাজ, এই থালীর গুণে তোমার অন্নের কোন অভাব থাকিবে না। প্রত্যহ যতক্ষণ না দ্রৌপদী নিজে আহার করিবেন, ততক্ষণ এই থালী অন্নব্যঞ্জনে পূর্ণ থাকিবে। লক্ষ লক্ষ অতিথিকে আহার করাইলেও তাহা ফুরাইবে না।" এই আশ্চর্য্য থালী পাইয়া যুধিষ্ঠিরের সকল ভাবনা ঘুচিয়া গেল।

হস্তিনা ছাড়িবার তিন দিন পরে পাণ্ডবেরা কাম্যকবনে উপস্থিত হইয়া, তথায় কিছুকাল বাস করিতে লাগিলেন। সূর্য্যের প্রসাদে অন্নচিন্তা ঘুচিয়াছে। দ্রৌপদী সকলকে পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করাইয়া শেষে নিজে খাইতেন। তাঁহার আহার-শেষে সমস্ত খাদ্য ফুরাইয়া যাইত। এই ভাবে তাঁহাদের দুঃখের দিনগুলিও বেশ সুখে কাটিতে লাগিল।

এই বনে এক দুরন্ত রাক্ষস ছিল। তাহার নাম কির্ম্মীর; ভীম একচক্রা নগরে যে বক রাক্ষসকে বধ করিয়াছিলেন, এই কির্ম্মীর সেই বকেরই ভাই। ইহার যেমন চেহারা তেমনি স্বভাব। এই দুরন্ত রাক্ষসের ভয়ে তপস্বীদের পর্য্যন্ত রাত্রে ভাল করিয়া নিদ্রা হইত না।

পাণ্ডবদিগকে দেখিয়া কির্ম্মীর ত চটিয়াই লাল! ভীম তাহার ভাইকে মারিয়াছেন, আজ সর্ব্বাগ্রেই ভীমকে মারিয়া সে বকের মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবে; তার পর আর সকলকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িবে! এই ভাবিয়া রাক্ষস চীৎকারে আকাশ ফাটাইয়া, মুখ দিয়া আগুন বাহির করিতে করিতে ভীমকে আক্রমণ করিল। ভীম কিন্তু অতি সংক্ষেপেই কার্য্য শেষ করিয়া ফেলিলেন। যুদ্ধ করিতে করিতে তিনি রাক্ষসের দুই পা ধরিয়া বন্ বন্ শব্দে এমন কয়েকটি ঘুরপাক দিলেন যে, সেই বিষম পাকে তাহার পেটের নাড়ী মাথায় গিয়া উঠিল। ইহার পর ভীম রাক্ষসের যে দশা করিলেন, তাহা বিশেষ করিয়া না বলাই ভাল! কির্ম্মীরের মৃত্যুতে

তপস্বীদের আনন্দ আর ধরে না! তাঁহারা দুই হাত তুলিয়া ভীমকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন!

এদিকে পাণ্ডবদের বনে পাঠাইয়া দুর্য্যোধন প্রভৃতির খুবই উল্লাস, কিন্তু নারদের কথা ভাবিতে ভাবিতে ধৃতরাষ্ট্র একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। বিদুর বলিলেন, "মহারাজ, আপনার দুষ্ট পুত্রগণই এই সর্ব্বনাশের মূল। তাহাদিগকে শাসন করুন এবং পাণ্ডবদিগকে ফিরাইয়া আনিয়া রাজ্যের ন্যায্য অংশ প্রদান করুন। তাহা হইলে সকল বিপদ্ কাটিয়া যাইবে।"

বিদুরের সুপরামর্শ ধৃতরাষ্ট্রের ভাল লাগিবে কেন? তিনি রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন, "তুমি শুধু পাণ্ডবদের হইয়াই কথা বল; আমার পুত্রদিগকে দেখিতে পার না। তুমি হস্তিনা হইতে দূর হও!"

বিদুর আর কোন কথা না বলিয়া তখনই কাম্যকবনে চলিয়া গেলেন হঠাৎ তাঁহাকে দেখিয়া পাণ্ডবেরা বেশ একটু ভয় পাইলেন। কি জানি, অন্ধরাজের মনে আবার হয় ত একটা কোন কু-অভিসন্ধি জাগিয়াছে! কিন্তু যখন শুনিলেন, ধৃতরাষ্ট্রের ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়া বিদুর হস্তিনা ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছেন, তখন তাঁহাদের বরং আনন্দই হইল।

বিদুরকে পাইয়া পাণ্ডবেরা সুখী হইলেন বটে, এদিকে কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের আহার-নিদ্রা বন্ধ। সে যে শুধু ভালবাসার খাতিরে, তাহা নহে; অন্ধরাজ জানিতেন, পাণ্ডবদের শারীরিক

বলের সহিত বিদুরের বুদ্ধিবল যুক্ত হইলে কৌরবদিগের রক্ষা থাকিবে না! তাই তাঁহাকে আনিবার জন্য তাড়াতাড়ি সঞ্জয়কে পাঠাইয়া দিলেন। বিদুর ফিরিয়া আসিলে ধৃতরাষ্ট্র অনেক মিষ্ট কথায় তাঁহাকে শান্ত করিলেন।

পাণ্ডবদের বনবাসের সংবাদ ক্রমে চারিদিকে প্রচার হইয়া পড়িল। ভোজ, বৃষ্ণি ও যদুবংশের বড় বড় বীর এবং পাঞ্চাল প্রভৃতি নানা রাজ্যের আত্মীয়-বন্ধুগণ কাম্যকবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বর্ব্বর কৌরবদিগের আচরণের কথা শুনিয়া রাগে ও ঘৃণায় কাঁপিতে কাঁপিতে সকলে এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তের বৎসর পরে যুদ্ধে দুর্য্যোধনের দর্প চূর্ণ করিয়া তাঁহারা যুধিষ্ঠিরকে হস্তিনার সিংহাসনে বসাইবেন।

নিদারুণ অপমানের কথা স্মরণ করিয়া দ্রৌপদী আর চক্ষের জল রাখিতে পারিলেন না। কৃষ্ণ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "কল্যাণি, এই কয়েকটা বৎসর অপেক্ষা কর; আমি নিশ্চিত বলিতেছি, যাহারা তোমাকে কাঁদাইয়াছে, তের বৎসর পরে পতি ও পুত্রশোকে তাহাদের রমণীগণ ধূলায় পড়িয়া লুটাইবে।"

শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি বিদায় গ্রহণ করিলে পর পাণ্ডবেরা দ্বৈতবনে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। আত্মীয়-স্বজনের প্রবোধবাক্যে এবং প্রকৃতির মনোরম সৌন্দর্য্যে ক্রমে সকলেই প্রফুল্ল হইয়া উঠিলেন, কিন্তু দ্রৌপদী তাঁহার প্রাণের বেদনা কিছুতেই ভুলিতে পারিলেন না। ভীম সর্ব্বদাই তাঁহাকে

সান্ত্বনা দিতেন। একদিন ভীম বলিলেন, "দাদা যদি অনুমতি করেন, তবে এখনই আমি কুলাঙ্গার দুর্য্যোধনকে বিনাশ করিয়া রাজ্য অধিকার করিতে পারি।"

এ কথা শুনিয়া যুধিষ্ঠির বলিলেন, "ভাই রাগের বশে কোন কাজ করিতে নাই। ইচ্ছা করিলেই ত আর শত্রু-কুলকে হারাইয়া দেওয়া যায় না! ভাবিয়া দেখ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি কিরূপ ভয়ানক যোদ্ধা! তাঁহাদের যে কেহ মনে করিলেই পৃথিবী জয় করিতে পারেন। এই সকল মহারথ যাহার সহায়, সেই দুর্য্যোধনকে যুদ্ধে হারাইয়া দেওয়া কি সহজ কথা! এ জন্যে অগ্রে প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক ।"

এইরূপ বাক্যালাপ চলিতেছে, এমন সময় হঠাৎ ব্যাসদেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন, "বৎস যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুনকে শিখাবার জন্য আমি তোমাকে 'প্রতিস্মৃতি' নামক এক আশ্চর্য্য বিদ্যার সন্ধান বলিয়া দিতেছি। ইহার প্রভাবে অর্জ্জুন দেবতাগণকে তুষ্ট করিয়া বড় বড় অস্ত্র লাভ করিতে পারিবে।"

অসময়ে এইরূপ সাহায্য পাইয়া যুধিষ্ঠিরের কিরূপ আনন্দ হইল, তাহা বুঝিতেই পার। অর্জ্জুন আর বিলম্ব না করিয়া অস্ত্রলাভের সমস্ত কৌশল শিখিয়া ফেলিলেন। তার পর শুভদিনের সকলের আশীর্ব্বাদ মস্তকে লইয়া তপস্যায় বাহির হইলেন।

হিমালয় প্রভৃতি পার হইয়া অর্জ্জুন ইন্দ্রকীল পর্ব্বতে

দেবরাজ ইন্দ্রের দর্শনলাভ করিলেন। তাঁহার প্রার্থনা শুনিয়া ইন্দ্র বলিলেন, "বৎস, তুমি মহাদেবকে তুষ্ট কর, তাহা হইলেই তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে।

ইন্দ্রের পরামর্শে অর্জ্জুন অতি কঠিন তপস্যা আরম্ভ করিলেন! ক্রমাগত চারি মাস তপস্যা করিলেন, মহাদেব কিরাতের বেশে অর্জ্জুনকে দেখা দিলেন। একটা শিকার লইয়া এই কিরাত আর অর্জ্জুনে মহাযুদ্ধ বাধিল। অর্জ্জুন সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইলেন। তখন মহাদেব নিজ পরিচয় দিয়া তাঁহাকে 'পাশুপত' নামে এক সাংঘাতিক অস্ত্র প্রদান করিলেন। এই অস্ত্রের এমনই তেজ যে, সমস্ত সৃষ্টি ভস্ম করিতে এক মুহূর্ত্তও লাগে না। মহাদেব প্রস্থান করিলে অন্যান্য দেবতাগণ দণ্ড, পাশ, শক্তি প্রভৃতি নানা অস্ত্র দিয়া অর্জ্জুনকে কৃতার্থ করিলেন।

তৎপরে অর্জ্জুন ইন্দ্রের রথে আরোহণ করিয়া স্বর্গে উপস্থিত হইলেন। সেখানে দেবরাজ তাঁহাকে এমন সকল আশ্চর্য্য অস্ত্র দান করিলেন যে, চোখে দেখা ত দূরের কথা, তাহাদের নাম পর্য্যন্ত কেহ কখনও শুনে নাই!

এদিকে অর্জ্জুন তপস্যায় বাহির হইলে পাণ্ডবেরা আবার কাম্যকবনে ফিরিয়া গেলেন। সেখানে বৎসরের পর বৎসর কাটিল, তবুও অর্জ্জুনের কোন খবর নাই! ক্রমে সকলেই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। এই সময় হঠাৎ একদিন মহর্ষি বৃহদশ্ব আসিয়া উপস্থিত। তাঁহাকে পাইয়া

পাণ্ডবদের আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি যে কয়দিন কাম্যকবনে ছিলেন, প্রায় সর্ব্বক্ষণ জপ, তপ ও নানা সৎপ্রসঙ্গে অতিবাহিত করিতেন। মাঝে মাঝে মুনিবর যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলার আশ্চর্য্য কৌশল শিক্ষা দিতেন। বিদায়কালে মহর্ষি পাণ্ডবদিগকে এই বলিয়া আশ্বাস দিয়া গেলেন যে, "তোমাদের দুঃখের দিন শীঘ্রই ফুরাইবে।"

ইহার কিছুকাল পরে স্বর্গ হইতে লোমশ মুনি কাম্যকবনে আসিলেন। পাণ্ডবদিগকে অর্জ্জুনের সংবাদ দিয়া তিনি বলিলেন, "অর্জ্জুন চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের কাছে আশ্চর্য্য সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন এবং ইন্দ্রের অস্ত্রে নিবাতকবচ নামক দৈত্যগণকে বধ করিয়া দেবতাদিগকে তুষ্ট করিয়াছেন।" ইহা শুনিয়া পাণ্ডবেরা অত্যন্ত সুখী হইলেন বটে, কিন্তু অর্জ্জুনের দীর্ঘ অদর্শনে তাঁহাদের যে কি ভয়ানক কষ্ট হইতেছে, তাহা গোপন রাখিতে পারিলেন না। মুনি বলিলেন, "তোমরা শান্ত হও। তিনি শীঘ্রই মর্ত্ত্যে ফিরিবেন। তাঁহার ইচ্ছা এই যে, কিছুকালের জন্য তোমরা তীর্থভ্রমণে বাহির হও।"

অর্জ্জুনের ইচ্ছা জানিতে পারিয়া পাণ্ডবেরা ধৌম্য ও লোমশ মুনির সহিত তীর্থভ্রমণের জন্য আশ্রম ত্যাগ করিলেন। তার পর কয়েকমাস তীর্থে তীর্থে কাটাইয়া একদিন তাঁহারা কৈলাস পর্ব্বতের নিকট উপস্থিত হইলে, প্রবল ঝটিকা আরম্ভ হইল। গন্ধমাদন পর্য্যন্ত পঁহুছিতে না পঁহুছিতে এমন অবস্থা হইল যে, কাহারও আর নড়িবার শক্তি

রহিল না। দ্রৌপদী ত অজ্ঞান হইয়াই, পড়িলেন। তখন ভীম ঘটোৎকচকে ডাকিলেন।

পিতার ডাকে ঘটোৎকচ একদল রাক্ষস লইয়া আসিয়া তাঁহাদের সকলকে বদরিকাশ্রমে পঁহুছাইয়া দিল। অর্জ্জুন এই স্থান হইতেই স্বর্গে গিয়াছিলেন। তাঁহার ফিরিবার আশায় পাণ্ডবেরা কিছুকাল এই আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন।

এখানে এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। একদিন কোথায় হইতে একটি সহস্রদল পদ্ম আসিয়া দ্রৌপদীর নিকট পড়িল। সে ফুলের শোভা কি চমৎকার! আর গন্ধই বা কি মনোহর। সমস্ত শরীর যেন জুড়াইয়া যায়! ফুলটি দেখিয়া দ্রৌপদী একেবারে পাগল! কিন্তু এমন ফুল কি কেবল একটিমাত্র পাইলে সাধ মিটে! সেইরূপ আরও অনেকগুলি ফুল আনিয়া দিবার জন্য দ্রৌপদী ভীমকে অনুরোধ করিলেন।

দ্রৌপদীর জন্য ভীম না করিতে পারেন, এমন কাজ নাই; তিনি তখনই ফুলের সন্ধানে বাহির হইলেন। ক্রমাগত বহুদূর চলিয়া ভীম শেষে একটি সরোবর দেখিতে পাইলেন। তাহাতে স্নানাদি শেষ করিয়া আবার অগ্রসর হইবেন, এমন সময় দেখিলেন, সম্মুখে একটা বানর পড়িয়া আছে।

ইঁহাকে সাধারণ বানর মনে করিয়া ভীম প্রথমে একটু ধমক্ দিতে ছাড়েন নাই, কিন্তু শেষে যখন ইঁহার প্রকৃত পরিচয় পাইলেন, তখন ভীমের মস্তক আপনাআপনি নত হইয়া পড়িল।

ইনি রামায়ণের সেই পবন-নন্দন মহাবীর হনূমান্। ভীমও পবনের পুত্র, সুতরাং হনূমান্ তাঁহার বড় ভাই। হঠাৎ সাক্ষাৎ হওয়াতে উভয়ের হৃদয়ে ভ্রাতৃস্নেহ উথলিয়া উঠিল।

কথায় কথায় ভীম হনূমান্‌কে পদ্মফুলের সন্ধান জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, "কৈলাস পর্ব্বতের উপর কুবেরের এক সরোবর আছে, সেইখানে এই ফুল দেখিতে পাইবে।"

তখন ভীম হনূমানের নিকট বিদায় লইয়া কৈলাস পর্ব্বতে যাত্রা করিলেন। তারপর সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, অনেক রাক্ষস প্রহরী সেই সরোবর পাহারা দিতেছে। তাহাদিগকে তাড়াইয়া ফুল সংগ্রহ করিতে প্রথমটা তাঁহাকে বেশ একটু বেগ পাইতে হইল। এমন কি কতকগুলা রাক্ষসও বধ করিতে হইল। কিন্তু কুবের যখন শুনিলেন, ভীম দ্রৌপদীর জন্য পদ্মফুল লইতে আসিয়াছেন, তখন আর তাঁহাকে কিছুমাত্র কষ্ট করিতে হইল না! কুবেরের আদেশে রাক্ষসেরাই ফুল সংগ্রহ করিয়া দিল।

এদিকে ভীমের বিলম্ব দেখিয়া যুধিষ্ঠির প্রভৃতি ভীত হইয়া ঘটোৎকচকে ডাকিলেন। ঘটোৎকচ তাঁহাদিগকে সেই সরোবরের তীরে পঁহুছাইয়া দিলে, কুবের আসিয়া সকলকে তাঁহার রাজধানী অলকাপুরীতে লইয়া গেলেন। সেখানে কিছুকাল অতি সুখে বাস করিয়া পাণ্ডবেরা বদরিকাশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন।

এইখানে জটাসুর নামে এক রাক্ষসের হস্তে যুধিষ্ঠির,

নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদীকে বিশেষ নাকাল হইতে হইয়াছিল। ভীম তাহার মুণ্ডপাত করিলেন।

ক্রমে অর্জ্জুনের মর্ত্ত্যে ফিরিবার সময় নিকটবর্ত্তী হইল। পাণ্ডবেরা গন্ধমাদন-পর্ব্বতে গিয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। হঠাৎ একদিন ইন্দ্রের রথের ঘর্ঘর শব্দে সকলের হৃদয় পুলকিত হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে অর্জ্জুন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পাঁচ বৎসর পরে তাঁহাকে পাইয়া সকলের যে কি আনন্দ, তাহা আর কি বলিব।

ইহার পর কাম্যকবনে যাইবার পথে পাণ্ডবেরা নানা রাজ্য ঘুরিয়া শেষে বিশখযুপ নামক স্থানে কয়েক দিন বাস করেন। সেখানে শিকারে বাহির হইয়া একদিন ভীম এক প্রকাণ্ড সর্পের মুখে পড়িলেন। এত যে তাঁহার বল বিক্রম, সে সব কোথায় চলিয়া গেল—ভীমের আর নড়িবারও শক্তি রহিল না!

তাঁহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে হঠাৎ যুধিষ্ঠির সেখানে উপস্থিত না হইলে সেদিন ভীমের যে কি অবস্থা হইত, বলা কঠিন। যুধিষ্ঠিরের পরিচয় পাইয়া সাপ বলিল, "তোমার ন্যায় আমিও চন্দ্রবংশের রাজা, আমার নাম নহুষ। অগস্ত্য মুনির শাপে আমার এই দশা হইয়াছে। আমি বহুদিন অনাহারে পড়িয়া আছি। সেই জন্য ভীম আমার বংশের লোক হইলেও আজ ইহাকে খাইব। তবে যদি তুমি আমার কয়েকটি প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পার, তাহা হইলে ইহাকে ছাড়িয়া দিব।" এই

বলিয়া সেই সর্পরূপী রাজা যুধিষ্ঠিরকে কতকগুলি কূট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। যুধিষ্ঠিরও একে একে সবগুলিরই উত্তর দিলেন। ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া রাজা ভীমকে মুক্তিদান করিলেন এবং নিজেও শাপমুক্তি হইয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন!

এই ঘটনার পর পাণ্ডবেরা কিছুকাল কাম্যকবনে বাস করিয়া আবার দ্বৈতবনে ফিরিয়া আসিলেন। এখানে ঘোষ-পল্লী নামক স্থানে ধৃতরাষ্ট্রের প্রায় এক লক্ষ্য গাভী পালিত হইত। একদিন কর্ণ ও শকুনি দুর্য্যোধনকে বলিলেন, "পাণ্ডবেরা এখন নিতান্ত ভিখারীর ন্যায় বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের পেটে অন্ন নাই, পরণে বসন নাই, মাথা রাখিবার স্থান নাই। তোমার অতুল ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া তাহাদের মনে ব্যথা দিবার এই উপযুক্ত অবসর! এস, সকলে মিলিয়া খুব জাঁকজমকে শোভা-যাত্রার আয়োজন করি! অন্ধরাজ আপত্তি করিলে বলিব, 'আমরা ঘোষপল্লীতে গরু দেখিতে যাইতেছি'।"

কোন একটা অন্যায় কাজের কথা শুনিলেই দুর্য্যোধনের মহা উৎসাহ হইত। কর্ণ ও শকুনির পরামর্শে তিনি হাতী-ঘোড়া, সৈন্য-সামন্ত লইয়া দ্বৈতবনে শোভা-যাত্রা করিলেন। মহিলাগণকেও সঙ্গে লইতে ভুলিলেন না।

পাণ্ডবেরা যেখানে বাস করিতেন, তাহার নিকটেই একটি সরোবর ছিল। একদিন গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন সপরিবারে সেই সরোবরে স্নান করিতেছেন আর চারিদিকে গন্ধর্ব্ব-সৈন্য

পাহারা দিতেছে, এমন সময় দুর্য্যোধন দল বল লইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন।

এই শোভা-যাত্রার উদ্দেশ্য কি, তাহা চিত্রসেন জানিতেন। তথাচ তিনি ভদ্রভাবে তাঁহাদিগকে অন্যত্র যাইতে বলিলেন, কিন্তু দুর্য্যোধন কি সোজাপথে চলিবার লোক! কথায় কথায় ক্রমে গালাগালি, শেষে দুই দলে মহাযুদ্ধ বাধিয়া গেল। কিন্তু গন্ধর্ব্ব সৈন্যের কাছে দাঁড়ায় কাহার সাধ্য? দুর্য্যোধনের চক্ষের সম্মুখেই তাঁহার হাজার হাজার সৈন্য নিহত হইল। যে কর্ণ-শকুনির এত দর্প, প্রাণভয়ে পলায়ন না করিলে তাঁহাদের যে কি দশা হইত, বলা যায় না। চিত্রসেন দুর্য্যোধন প্রভৃতি কৌরবদলের কয়েকজনকে বন্দী করিলেন!

যুধিষ্ঠির এই সংবাদ পাইবামাত্র ভীম-অর্জ্জুনকে রণসজ্জা করিতে আদেশ করিলেন। ভীম বলিলেন, "বেশ ত, যেমন কুলাঙ্গার, তেমনই শাস্তি হইয়াছে। আমাদিগকে আর কষ্ট পাইতে হইবে না।" তখন যুধিষ্ঠির বলিলেন, "এ কি কথা, ভীম! গন্ধর্ব্বেরা আমাদের বংশের অপমান করিতেছে, এ সময় কি তোমার মুখে ওকথা শোভা পায়? ভাই ভাই আমাদের যতই বিবাদ থাক, অপরের সহিত যুদ্ধে আমরা এক শত পাঁচ ভাই। তোমরা এখনই তাহাদিগকে ছাড়াইয়া আন।"

ইহার পর ভীম ও অর্জ্জুন যখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন গন্ধর্ব্ব-সৈন্যের দুর্দ্দশার একশেষ হইল। চিত্রসেন বিপাকে

পড়িয়া অর্জ্জুনের শরণ লইতে বাধ্য হইলেন। স্বর্গে এই চিত্রসেনই অর্জ্জুনকে সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। পরস্পর সাক্ষাৎমাত্র সকল বিবাদ মিটিয়া গেল। দুই বন্ধুতে কোলাকুলি করিয়া যার-পর-নাই আনন্দিত হইলেন। চিত্রসেন বলিলেন, "এই দুষ্টেরা গরু দেখার ছল করিয়া তোমাদিগকে অপমান করিতে আসিয়াছিল। তাই আমি ইহাদিগকে বাঁধিয়াছি।" সে কথায় অর্জ্জুন বলিলেন, "বেশ, উপযুক্ত শিক্ষাই হইয়াছে।"

ইহার পর সকলে যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি স্বহস্তে দুর্য্যোধন প্রভৃতির বন্ধন খুলিয়া দিলেন এবং শোভা-যাত্রার উদ্দেশ্য শুনিয়া বলিলেন, "ভাই, এমন কাজ আর করিও না।"

দুর্য্যোধন লজ্জায় অধোবদন হইয়া সপরিবারে হস্তিনা যাত্রা করিলেন। পথে কর্ণ ও শকুনির সহিত সাক্ষাৎ হইলে বলিলেন, "তোমরা যে কে কত বড় বীর, তাহা বুঝিতে আর বাকি নাই। আমার সকল সাধই মিটিয়াছে; তোমরা ফিরিয়া যাও। দুঃশাশন হস্তিনার রাজা হউক। আমার এখন মৃত্যুই ভাল।"

দুর্য্যোধনের মান কি সহজে ভাঙ্গে! কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসন কত কষ্টে যে তাঁহাকে প্রবোধ দিয়াছিলেন, তাহা আর কি বলিব! যাহা হউক, শেষে সকলে হস্তিনায় উপ-স্থিত হইলে কর্ণ স্পর্দ্ধা করিয়া বলিলেন, "পাণ্ডবেরা চারি

ভাইয়ে মিলিয়া পৃথিবী জয় করিয়াছে, আমি একাই তাহা করিব।”

কর্ণের বাক্যে দুর্য্যোধন খুবই খুসী হইলেন এবং তাঁহার দিগ্বিজয়ের সকল রকম অয়োজন করিয়া দিলেন। বীরত্বে কর্ণও বড় কম ছিলেন না। অতি অল্পদিনের মধ্যেই তিনি চারিদিকের সকল রাজাকে পরাস্ত করিয়া হস্তিনায় ফিরিয়া আসিলেন। এতদিন অর্জ্জুনের কথা ভাবিয়া দুর্য্যোধন সর্ব্বদাই উদ্বিগ্ন থাকিতেন, এখন কর্ণের বিক্রম দেখিয়া তাঁহার সাহস খুব বাড়িয়া গেল। এই ঘটনা উপলক্ষ্যে এক মহা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া দুর্য্যোধন দুই হাতে ধন-রত্ন বিতরণ করিতে লাগিলেন।

যজ্ঞ-শেষে কর্ণ প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যতদিন না তিনি অর্জ্জুনকে বধ করিতে পারেন, ততদিন পা ধুইবেন না, জলপান করিবেন না অথবা কেহ কিছু চাহিলে তাহাকে শুধু হাতে ফিরাইবেন না।

এই প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া কৌরবেরা আনন্দে নাচিয়া উঠিল। যুধিষ্ঠির কিন্তু কর্ণের কুণ্ডল ও অভেদ্য কবচের কথা ভাবিয়া বিশেষ ভয় পাইলেন।

এই ঘটনার পর একদিন দশ হাজার শিষ্য সহ দুর্ব্বাসা মুনি আসিয়া দুর্য্যোধনের আতিথ্যগ্রহণ করিলেন। মুনি যে কিরূপ বদ্‌রাগী, দুর্য্যোধনের তাহা বিশেষরূপে জানা ছিল। সেই জন্য এমন সাবধানে তিনি তাঁহার সেবা পরিচর্য্যা

করিতে লাগিলেন যে, কোপন-স্বভাব দুর্ব্বাসাও অসন্তুষ্ট হইবার কারণ খুঁজিয়া পাইলেন না। বিদায়কালে দুর্ব্বাসা বর দিতে চাহিলে দুর্য্যোধন বলিলেন, "আপনি যদি দয়া করিয়া দ্রৌপদীর আহার-শেষে সশিষ্য পাণ্ডবদের আতিথ্য-গ্রহণ করেন, তবেই আমি কৃতার্থ হই।"

এই কথায় সম্মত হইয়া মুনিবর প্রস্থান করিলে দুর্য্যোধন ভাবিলেন, 'পাণ্ডবদের আর রক্ষা নাই। অসময়ে দশ হাজার শিষ্যসহ দুর্ব্বাসাকে পরিতোষপূর্ব্বক আহার করান তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং মুনির সাপে এবার সকলকে ভস্ম হইতে হইবে!' কর্ণ ও শকুনি দুর্য্যোধনের এই ফন্দীর কথা শুনিয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন।

পাণ্ডবেরা তখন কাম্যকবনে বাস করিতেছিলেন। এক রাত্রিকালে আহারাদির পর সকলে বিশ্রাম করিতেছেন, ঘরে আর একরত্তি কিছুই নাই, এমন সময় সশিষ্য দুর্ব্বাসা আসিয়া উপস্থিত! তাঁহাকে দেখিয়া যুধিষ্ঠির মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন! এখন উপায়!

দ্রৌপদী যখন শুনিলেন যে, মুনিবর সকলের আহারের আয়োজন করিতে বলিয়া স্নান আহ্নিকের জন্য গঙ্গায় গিয়াছেন, তখন ভয়ে তাঁহার আপদমস্তক কাঁপিতে লাগিল। না জানি কপালে কত দুঃখই আছে! অন্য উপায় না দেখিয়া দ্রৌপদী প্রাণপণে শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিতে লাগিলেন। সে কাতর ডাক কি বৃথা হইতে পারে? চক্ষের পলকে কৃষ্ণ দেখা দিয়া

বলিলেন, "ভয় কি, আমি সব ব্যবস্থা করিতেছি! ক্ষুধায় আমি বড় কাতর; অগ্রে আমাকে কিছু খাইতে দাও।"

দ্রৌপদী বলিলেন, "থালী যে শূন্য! ঘরে একটি ক্ষুদ্র-গুড়াও নাই, কি দিব?"

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "ভাল করিয়া দেখ, সামান্য কিছু হইলেই চলিবে।"

তখন দ্রৌপদী থালীখানা লইয়া আসিলেন। কৃষ্ণ বলিলেন, "ঐ যে শাক-ভাতের কণা রহিয়াছে, উহাতেই আমার তৃপ্তি হইবে!"

ইহার পর দ্রৌপদী লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া সেই কণিকা-পরিমাণ শাক ও ভাত কৃষ্ণকে দিলে, তিনি তাহা মুখে দিয়া বলিলেন, "বিশ্বাত্মা পরিতৃপ্ত হউক।"

ওদিকে কোথায় দুর্ব্বাসা ও তাঁহার শিষ্যগণ তাড়াতাড়ি স্নান-আহ্নিক সারিয়া খাইতে আসিবেন, না সকলের পেট ফুলিয়া দম্‌সম্! আর তাঁহাদের উদ্গারেরই বা কি ঘটা! হঠাৎ এরূপ হইবার কারণ কি, বুঝিতে না পারিয়া সকলে ত অবাক্। মুনিঠাকুরেরা সে রাত্রি গঙ্গার তীরেই পড়িয়া রহিলেন! ভোর হইলে দুর্ব্বাসা সকলকে জাগাইয়া বলিলেন, "এবার পাণ্ডবদের কাছে আচ্ছা জব্দই হইলাম। খাওয়া-দাওয়া মাথায় থাক, এখন চল পলাইয়া বাঁচি।" এই বলিয়া মুনিবর সকলকে লইয়া অধোবদনে প্রস্থান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের দয়ায় পাণ্ডবদের সকল বিপদ্ কাটিয়া গেল।

এ সংবাদ হস্তিনায় পঁহুছিলে দুর্য্যোধন খুব দুঃখিত হইলেন বটে, কিন্তু পাণ্ডববিনাশে একেবারে নিরাশ হইলেন না।

অন্যায় কাজে তাঁহার মত সিদ্ধহস্ত আর কে! এবার তিনি মনে মনে দ্রৌপদী-হরণের ফন্দী আঁটিলেন। দুর্য্যোধন ভাবিলেন, 'কেহ যদি কৌশলে দ্রৌপদীকে হরণ করিয়া আনিতে পারে, তাহা হইলে পত্নীর শোকে পাণ্ডবেরা নিশ্চিতই প্রাণ বিসর্জ্জন দিবে!' এই ভাবিয়া তিনি তাঁহার ভগিনীপতি জয়দ্রথকে কাম্যকবনে পাঠাইয়া দিলেন।

দুষ্টের কুপরামর্শে এই ভয়ানক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া জয়দ্রথকে ভীম অর্জ্জুনের হস্তে বিলক্ষণ নাকাল হইতে হইল। যুধিষ্ঠির রক্ষা না করিলে সে যাত্রা তাঁহার প্রাণ লইয়া ফিরিয়া আসাই কঠিন হইত।

সেখান হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া জয়দ্রথ হিমালয়ে গিয়া মহাদেবের তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন! মহাদেব প্রসন্ন হইয়া এই বর দিলেন যে, "তুমি অর্জ্জুন ব্যতীত অপর চারি পাণ্ডবকে পরাজয় করিতে পারিবে।"

বনবাসের দিন যতই ফুরাইয়া আসিতে লাগিল, কর্ণের অর্জ্জুনবধের প্রতিজ্ঞা এবং তাঁহার অভেদ্য কবচ ও কুণ্ডলের কথা ভাবিয়া যুধিষ্ঠির ততই উদ্বিগ্ন হইতে লাগিলেন। এদিকে দেবরাজ ইন্দ্র অর্জ্জুনের রক্ষার জন্য এক আশ্চর্য্য উপায় স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন।

কর্ণ প্রতিদিন স্নানের পর সূর্য্যের আরাধনা করিতেন।

সেই সময় কোন প্রার্থীকেই তিনি নিরাশ করিতেন না। পূর্ব্ব-প্রতিজ্ঞামত, যে যাহা চাহিত, কর্ণ তাহাকেই তাহা দান করিতেন।

একদিন এইরূপ সময়ে স্বয়ং ইন্দ্রদেব ব্রাহ্মণের বেশে, কর্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহার কবচ ও কুণ্ডল প্রার্থনা করিলেন। ইন্দ্র যে এইজন্য ছদ্মবেশে আসিবেন, এ কথা সূর্য্যদেব পূর্ব্বেই কর্ণকে বলিয়াছিলেন এবং এ বিষয়ে তাঁহাকে সতর্ক করিতেও ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু কর্ণের ন্যায় বীর পুরুষ কি আপনার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে পারেন! ইন্দ্রের প্রার্থনামত কবচ ও কুণ্ডল দিয়া কর্ণ তাঁহার নিকট হইতে 'এক-পুরুষ-ঘাতিনী' শক্তি চাহিয়া লইলেন। এই মহাশক্তি প্রদান করিয়া দেবরাজ বলিলেন, "যখন আর কোন অস্ত্রেই আত্মরক্ষা সম্ভব নয়, কেবল তখনই এই অস্ত্র ব্যবহার করিতে পারিবে। একবার ব্যবহারের পর আমার অস্ত্র আবার আমার নিকটেই ফিরিয়া আসিবে।"

ইন্দ্রের কৌশলে কর্ণ কবচ ও কুণ্ডলহীন হইয়াছেন শুনিয়া, পাণ্ডবেরা যেমন সুখী হইলেন, দুর্য্যোধন প্রভৃতি কৌরবগণ তেমন ভয় পাইলেন।

এই ঘটনার পর পাণ্ডবেরা আবার দ্বৈতবনে ফিরিয়া আসিলেন। একদিন সেখানে এক ব্রাহ্মণের অনুরোধে একটা হরিণ তাড়াইতে গিয়া পাঁচ ভাই পিপাসা ও শ্রমে একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন।

নিকটে এক জলাশয় ছিল। যুধিষ্ঠিরের আদেশে নকুল জল আনিতে যাইলে, এক যক্ষ তাঁহাকে জল লইতে নিষেধ করিলেন। যক্ষের কথা অমান্য করিয়া নকুল যেই ঘাটে নামিয়াছেন, অমনি তাঁহার মৃত্যু হইল।

নকুলের বিলম্ব দেখিয়া যুধিষ্ঠির সহদেবকে পাঠাইলেন। তিনিও আর ফিরিয়া আসিলেন না। ক্রমে ভীম এবং অর্জ্জুনেরও সেই দশা হইল। তখন স্বয়ং যুধিষ্ঠির তথায় উপস্থিত হইয়া ভ্রাতৃশোকে হাহাকার করিতে লাগিলেন।

এক বক তখন যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমিই তোমার ভাইগুলিকে মারিয়াছি। আমার কথার উত্তর না দিয়া জলপান করিলে তোমারও প্রাণ যাইবে।"

যুধিষ্ঠির আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "সামান্য বকের সাধ্য কি যে, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেবকে বধ করে! আপনি নিশ্চিতই কোন মহাপুরুষ! আপনার কি জিজ্ঞাস্য আছে, তাহা জানিতে পারি কি?"

তখন সেই বক যক্ষের আকার ধারণ করিয়া এমন কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন যে, যুধিষ্ঠির ভিন্ন আর কাহারও পক্ষে সেগুলির সদুত্তর দেওয়া সম্ভব নহে। যুধিষ্ঠিরের উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া যক্ষ বলিলেন, "মহারাজ, আমি বড় খুসী হইলাম। তোমার চারি ভাইয়ের মধ্যে যে কোন একজনের নাম কর, আমি তাহাকে বাঁচাইয়া দিব।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "নকুলকে বাঁচাইয়া দিন।"

ইহাতে যক্ষ নিতান্ত আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "ভুবন-বিজয়ী বীর ভীম অর্জ্জুনকে ছাড়িয়া তুমি নকুলের জীবন প্রার্থনা করিলে, ইহার অর্থ কি ?"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "আমাদের দুই মাতা। নকুল বাঁচিয়া উঠিলে দুই মায়েরই এক একটি সন্তান জীবিত থাকি। সেই জন্য আমি নকুলের জীবন প্রার্থনা করিয়াছি।"

এ কথায় যক্ষ পরম সন্তুষ্ট হইয়া ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব—সকলকেই বাঁচাইয়া দিলেন। তারপর নিজের পরিচয় দিয়া বলিলেন, "বৎস যুধিষ্ঠির, আমি ধর্ম্ম। তোমাকে পরীক্ষা করিবার জন্যই এখানে আসিয়াছি। তোমার সাধুতায় আমি অত্যন্ত সুখী হইলাম। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার এই সাধুতা দিন দিন বর্দ্ধিত হউক। বনবাসের বার বৎসর কাটিয়াছে। এখন তোমরা বিরাটনগরে গিয়া অজ্ঞাতবাস কর; আমার আশীর্ব্বাদে কেহই তোমাদের সন্ধান করিতে পারিবে না।"

এই বলিয়া ধর্ম্ম শূন্যে মিলাইয়া গেলেন। পাণ্ডবেরাও আনন্দিত মনে স্বস্থানে ফিরিয়া আসিলেন।

বিরাটপর্ব্ব

ধর্ম্মের উপদেশে পাণ্ডবেরা অজ্ঞাতবাসের এক বৎসর বিরাট নগরে বাস করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। ভাল লোক বলিয়া মৎস্যরাজ বিরাটের খুবই সুখ্যাতি ছিল। সুতরাং এমন নিরাপদ আশ্রয় আর কোথায় মিলিবে? কিন্তু কি ভাবে উপস্থিত হইলে, সেখানে থাকাও চলিবে, অথচ লোকে তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিবে না, সেইটাই ভাবিবার কথা।

যাহা হউক, শেষে এই স্থির হইল যে, যুধিষ্ঠির 'কঙ্ক' নাম লইয়া গরীব ব্রাহ্মণের বেশে, ভীম 'বল্লব' নাম লইয়া পাচকের বেশে, দ্রৌপদী মলিন বসন পরিয়া 'সৈরিন্ধ্রীর' বেশে এবং অর্জ্জুন 'বৃহন্নলা' নাম লইয়া স্ত্রীবেশে রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন কাজ প্রার্থনা করিবেন। শেষে নকুল 'গ্রন্থিক' নাম লইয়া অশ্বপালকের এবং সহদেব 'তন্ত্রিপাল' নাম লইয়া গো-রক্ষকের কাজের জন্য চেষ্টা করিবেন।

এই সকল নাম ছাড়া তাঁহারা পাঁচভাইয়ের যথাক্রমে আরও পাঁচটি নাম ঠিক করিলেন। যথা—জয়, জয়ন্ত, বিজয়, জয়ৎসেন ও জদ্বেল। এগুলি তাঁহাদের গোপনীয় নাম। এই নামে তাঁহারা পরস্পরের মধ্যে পরিচিত হইবে, অথচ বাহিরের কেহ জানিতে পারিবে না।

এইরূপে প্রস্তুত হইয়া পাণ্ডবেরা সঙ্গের লোকজন সকলকে বিদায় দিলেন এবং নানা রাজ্য, বন-উপবন, পাহাড়-পর্ব্বত পার হইয়া ক্রমে বিরাট নগরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে এক শ্মশানের পাশে প্রকাণ্ড একটি শমীগাছ ছিল। নকুল সেই গাছে উঠিয়া তীর, ধনু, খড়্গ প্রভৃতি অস্ত্র কৌশলে লুকাইয়া রাখিলেন এবং শ্মশান হইতে একটি মৃতদেহ আনিয়া ঐ গাছের ডালে ঝুলাইয়া দিলেন। এরূপ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, মড়া দেখিলে লোকে ভূতের ভয়ে সেদিকেও যাইবে না।

ইহার পর তাঁহারা নিজ নিজ বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া ক্রমে রাজসমীপে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। প্রথম আসিলেন যুধিষ্ঠির। তাঁহার মুখশ্রী দেখিয়া রাজা একেবারে মোহিত হইয়া গেলেন। ব্যগ্রভাবে পরিচয় জিজ্ঞসা করিলে, যুধিষ্ঠির বলিলেন, "আমার নাম কঙ্ক। পাশা খেলায় আমি খুব দক্ষ। রাজা যুধিষ্ঠির আমাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন; এখন দুঃখে পড়িয়া আপনার কাছে আসিয়াছি।" যুধিষ্ঠিরের কথা শুনিয়া রাজার প্রাণ গলিয়া গেল। তিনি আনন্দের সহিত তাঁহাকে আপনার সভাসদ্ নিযুক্ত করিলেন।

তার পর আসিলেন ভীম। তাঁহার বেশ-ভূষা ঠিক পাচক-ব্রাহ্মণের মত। ভীম আসিয়াই বলিলেন, "জয় হউক মহা-রাজ, আমার নাম বল্লব। পূর্ব্বে আমি যুধিষ্ঠিরের প্রধান পাচক ছিলাম, এখন কাজের সন্ধানে আপনার নিকট

আসিয়াছি। দয়া করিয়া কাজ দিলে, আপনাকে সন্তুষ্ট করিতে বিশেষ চেষ্টা করিব। আমি একটু আধটু কুস্তি খেলাও জানি।"

ভীমের কথা শুনিয়া রাজা তাঁহাকে আপনার প্রধান পাচক নিযুক্ত করিলেন।

এই সময় বাহিরে হঠাৎ দ্রৌপদীকে দেখিয়া সকলের চোখ সেই দিকে পড়িল। তাঁহার বসন নিতান্ত মলিন বটে, কিন্তু এমন আশ্চর্য্য সুন্দরী কেহ কখনও দেখে নাই। অন্যের কথা দূরে থাক, রাণী সুদেষ্ণাও ছাদের উপর হইতে তাঁহাকে দেখিয়া মোহিত ও চমৎকৃত হইলেন। তখনই তাঁহাকে অন্তঃপুরে আনাইয়া ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা তুমি কে? তুমি কি কোন দেবী, না, আর কিছু?"

দ্রৌপদী বলিলেন, "না মা, আমি দেবীও নই, পরীও নই; আমি অতি সামান্য নারী, সৈরিন্ধ্রীর কাজ করিয়া দিন কাটাই। পাঁচটি গন্ধর্ব্ব আমার স্বামী, তাঁহারাই সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা করেন। পূর্ব্বে আমি সত্যভামা ও দ্রৌপদীর নিকট ছিলাম, এখন কাজের চেষ্টায় আপনার কাছে আসিয়াছি।"

দ্রৌপদীকে দেখিয়া রাণীর এতই ভাল লাগিয়াছিল যে, তিনি তাঁহাকে কাজে নিযুক্ত করিতে মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিলেন না। তখন দ্রৌপদী বলিলেন, "মা, আগেই আমি দুইটি কথা বলিয়া রাখিতে চাই। আমি কাহারও পায়ে হাত দিব

না বা কাহারও উচ্ছিষ্ট খাইব না। কারণ, এইরূপ হীন কাজ আমার স্বামীরা পছন্দ করেন না। রাণী সুদেষ্ণা তাহাতেই রাজী হইলেন।

ইহার পর অর্জ্জুন স্ত্রীবেশে আসিয়া বৃহন্নলা নামে পরিচয় দিলেন এবং রাজকুমারীদিগের নাচ-গানের শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। শেষে নকুল গ্রন্থিক নামে এবং সহদেব তন্ত্রিপাল নামে পরিচয় দিয়া যথাক্রমে অশ্বশালা ও গোশালার ভার প্রাপ্ত হইলেন।

এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন কাজে নিযুক্ত হইয়া যুধিষ্ঠির প্রভৃতি বিরাটের গৃহে এমন ছদ্মভাবে বাস করিতে লাগিলেন যে, কাহার সাধ্য তাঁহাদিগকে পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী বলিয়া চিনিতে পারে! অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহারা রাজার খুব প্রিয় হইয়া উঠিলেন। আর ভীম জীমূত নামে একজন বিখ্যাত পালোয়ানকে কুস্তীতে হারাইয়া রাজা-প্রজা সকলেরই প্রশংসা ভাজন হইলেন।

অজ্ঞাতবাসের প্রথম দশ মাস এক রকম সুখেই কাটিয়া গেল। তার পর সেনাপতি কীচকের কু-দৃষ্টিতে পড়িয়া দ্রৌপদীকে যে কি পর্য্যন্ত জ্বালাতন হইতে হইল, তাহা আর বলিবার নয়! একে কীচক রাজ্যের সেনাপতি, তাহাতে আবার সুদেষ্ণার সহোদর ভাই; সুতরাং কাহাকেও সে গ্রাহ্যই করিত না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, বিরাটরাজ নিজেও তাহাকে ভয় করিয়া চলিতেন। এই দুর্ব্বৃত্তের ভয়ে দ্রৌপদীর

আহার নিদ্রা বন্ধ হইল ; তাঁহাকে দেখিলেই সে অপমান করিত। একদিন এমন হইল যে, দ্রৌপদী ভয়ে পলাইয়া রাজার কাছে গিয়াও রক্ষা পাইলেন না, কীচকও ছুটিতে ছুটিতে সভার মাঝে গিয়া সকলের সম্মুখেই তাঁহাকে পদাঘাত করিল। রাজার এমন সাহস হইল না যে একটি কথা বলেন!

সেখানে যুধিষ্ঠির ও ভীম উপস্থিত ছিলেন। দ্রৌপদীর অপমানে ভীম আগুন হইয়া উঠিলেন। যুধিষ্ঠির দেখিলেন, ভীম যদি একটা কিছু করিয়া বসেন, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রকৃত পরিচয় জানিতে আর কাহারও বাকী থাকিবে না। সেইজন্য তাড়াতাড়ি তিনি ইঙ্গিত করিয়া ভীমকে শান্ত করিলেন আর দ্রৌপদীকে বলিলেন,—"সৈরিন্ধ্রী, তুমি বাড়ীর ভিতর যাও। সময় বুঝিয়া তোমার গন্ধর্ব্ব স্বামীরা এ অত্যাচারের প্রতীকার করিবেন, সন্দেহ নাই।"

আপাততঃ গোলযোগ মিটিয়া গেল বটে, কিন্তু দ্রৌপদীর উত্তেজনা এবং ভীমের রাগ কিছুতেই কমিল না। ইহার পর দ্রৌপদী পাকশালায় গিয়া ভীমের সহিত দেখা করিলেন। উভয়ে পরামর্শ হইল, রাত্রে কোনও মতে কীচককে ভুলাইয়া মেয়েদের নাট্যশালায় লইয়া যাইতে হইবে। তার পর ভীম তাহাকে দেখিয়া লইবেন।

তাঁহাদের কৌশলে ভুলিয়া শেষ রাত্রে কীচক সুন্দর বেশ ভূষা করিয়া নাট্যশালায় উপস্থিত হইল। ভীম অগ্রেই সেখানে লুকাইয়া ছিলেন। তাঁহাকে দ্রৌপদী ভাবিয়া

কীচক যেই দুই পা অগ্রসর হইয়াছে, অমনি ভীম তাহাকে আক্রমণ করিলেন। কীচকও বড় সহজ বীর ছিল না, কিন্তু ভীমের কাছে পারিবে কেন? যুদ্ধ করিতে করিতে ভীম এমনই উত্তেজিত হইয়া পড়িলেন যে, কীচকের হাত, পা ও মাথা তাহার পেটের মধ্যে না ঢুকাইয়া ছাড়িলেন না! সে অবস্থায় দেখিলে তাহাকে মানুষ বলিয়া চিনে কাহার সাধ্য! ঠিক যেন একটা প্রকাণ্ড মাংসের পিণ্ড।

ভীম চলিয়া গেলে দ্রৌপদী আসিয়া বলিলেন, "আমার গন্ধর্ব্ব স্বামীর হস্তে দুষ্টের এই শাস্তি হইয়াছে।"

সেনাপতির মৃত্যুতে রাজ্যের সকলেই ভয় পাইল! রাজা-রাণীও বিশেষ দুঃখিত হইলেন। সুদেষ্ণার আরও একশত পাঁচ ভাই ছিল। তাহারা একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিল এবং দ্রৌপদীকেই কীচকের মৃত্যুর একমাত্র কারণ জানিয়া, ভ্রাতার মৃতদেহের সহিত তাঁহাকেও বাঁধিয়া শ্মশানে লইয়া চলিল। এতগুলা মণ্ডার হাতে পড়িয়া দ্রৌপদীর দুর্দ্দশার অবধি রহিল না। কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি শুধু 'জয়' 'জয়ন্ত' 'বিজয়' ইত্যাদি বলিয়া ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন।

সে রাত্রে ভীমের আর নিদ্রা হইল না। দ্রৌপদীর কান্না শুনিয়া তিনি সাজ-পোষাক বদলাইয়া তখনই শ্মশানে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং একে একে কীচকের সব ভাই-গুলিকে যমালয়ে পাঠাইয়া দ্রৌপদীকে উদ্ধার করিলেন। রাত্রের অন্ধকারে কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারিল না।

ইহার পর গন্ধর্ব্বের ভয়ে বিরাটরাজ্যে লোকের বাস করাই দায় হইয়া উঠিল। রাজার অনুরোধে রাণী সুদেষ্ণা দ্রৌপদীকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমিই এই সকল অনর্থের মূল! তোমাকে আশ্রয় দিতে আর সাহস হয় না!"

অজ্ঞাতবাসের বৎসর পূর্ণ হইতে আর তের দিন মাত্র বাকি ছিল। সেইজন্য দ্রৌপদী বলিলেন, "মা এতদিনই যদি আশ্রয় দিয়াছেন, দয়া করিয়া আর কয়েকটা দিন অপেক্ষা করুন। তার পর আমি নিজেই চলিয়া যাইব। বিশ্বাস করুন, এই সময়ের মধ্যে আমার স্বামীরা কোনই উৎপাত করিবে না।" এ কথায় সুদেষ্ণা আর কোন আপত্তি করিলেন না।

এদিকে দুর্য্যোধনের গুপ্তচর পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের প্রথম হইতেই দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু কোথাও যখন তাঁহাদের সন্ধান পাওয়া গেল না, তখন ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর প্রভৃতি কয়েকজন ভিন্ন আর সকলেই মনে করিল, পাণ্ডবেরা জীবিত নাই! যে সকল চর বিরাট-রাজ্যে গিয়াছিল, তাহারা ফিরিয়া আসিলে, গন্ধর্ব্বের হস্তে সেনাপতি কীচক এবং তাঁহার ভাইদের মৃত্যুর কথা শুনিয়া হস্তিনায় সকলেই খুব খুসী হইল।

এই কীচকের ভয়ে এত দিন কেহ বিরাটের ত্রিসীমায়ও ঘেঁসিতে সাহস করে নাই। এখন ত্রিগর্ত্ত দেশের রাজা

সুশর্ম্মার কু-পরামর্শে দুর্য্যোধন প্রভৃতি কৌরবগণ বিরাটরাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন।

ইহার পর মৎস্যরাজ হঠাৎ একদিন খবর পাইলেন যে, সুশর্ম্মা বহু সৈন্য লইয়া বিরাটের এক প্রান্ত আক্রমণ করিয়াছে এবং গোয়ালাদিগকে প্রহার করিয়া হাজার হাজার গাভী লইয়া পলাইতেছে। রাজ্যময় অমনি যুদ্ধের তূরী, ভেরী বাজিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে সৈন্যের দল প্রস্তুত হইল; রাজা স্বয়ং সেনাপতি, সুতরাং লোকের উৎসাহের আর শেষ নাই। রাজ্যের ছোট বড় সকলেই চলিল। এমন কি, যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেবও বাদ পড়িলেন না।

যথাসময়ে দুই দলে মহা যুদ্ধ বাধিয়া গেল। চারিদিকেই হৈ হৈ—রৈ রৈ—মার্ মার্—কাট্ কাট্—শব্দ! সারাদিন ধরিয়া যুদ্ধ চলিল। দিনের পর রাত আসিল তবুও যুদ্ধের বিরাম নাই।

এই সময় হঠাৎ দেখিতে পাওয়া গেল, সুশর্ম্মা মৎস্য-রাজকে বাঁধিয়া লইয়া তাড়াতাড়ি রথ ছুটাইয়া দিয়াছে! আর বিরাটের সৈন্যসামন্ত ছত্রভঙ্গ হইয়া ভয়ে চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছে। ইহাতে যুধিষ্ঠির একটু ব্যস্ত হইয়া ভীমকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমরা উপস্থিত থাকিতে রাজার এ দুর্গতি! তুমি এখনই গিয়া সুশর্ম্মার হস্ত হইতে উহাকে উদ্ধার কর। কিন্তু সাবধান! এমন ভাবে যুদ্ধ করিবে, যেন কেহে তোমাকে চিনিতে না পারে।"

যুধিষ্ঠিরের কথায় ভীম উৎসাহে মাতিয়া উঠিলেন। ইহার পর ভীম যখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন লোকের মুখে শুধুই 'হায়' 'হায়'—'হায়' 'হায়' শব্দ! সাধারণ সৈন্যের ত কথাই নাই, ত্রিগর্ত্তরাজের বড় বড় সেনাপতিরাও ভয়ে ছুটাছুটি করিতে লাগিল! স্বয়ং সুশর্ম্মা পলাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও রক্ষা পাইল না। ভীম বিরাট-রাজাকে মুক্তি দিয়া তাঁহার পরিবর্ত্তে সুশর্ম্মাকেই বাঁধিয়া লইয়া আসিলেন। আহা, কি কুক্ষণেই বেচারা যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিল! ভীমের লাথি চড়, আর ঘুসিতে সে প্রায় আধমরা হইয়া পড়িল

সুশর্ম্মার দুর্দ্দশা দেখিয়া যুধিষ্ঠির বলিলেন, "এই দুষ্টের উপযুক্ত শাস্তি হইয়াছে, এখন ইহাকে ছাড়িয়া দাও।" যুধিষ্ঠিরের কৃপায় বন্ধনমুক্ত হইয়া সুশর্ম্মা তাঁহাদিগকে নমস্কার করিয়া নত মস্তকে প্রস্থান করিল। তখন রাজা বিরাট কৃতজ্ঞহৃদয়ে পাণ্ডবদিগকে বলিলেন, "আপনাদের দয়াতেই আমার রাজ্য-ধন মান সমস্ত রক্ষা হইল। এই উপকারের কি প্রতিদান দিব? আমার সিংহাসন দিলেও, বোধ করি, যথেষ্ট হয় না!" যুধিষ্ঠির বলিলেন, "আপনার সামান্য উপকার করিতে পারিয়াছি, ইহাতেই আমরা সুখী, পুরস্কারের কোনই প্রয়োজন নাই"

এদিকে সুশর্ম্মার সহিত যুদ্ধে যখন সকলেই ব্যস্ত, সেই সময় অসংখ্য সৈন্য লইয়া দুর্য্যোধন বিরাটের অপর প্রান্ত

আক্রমণ করিলেন। তাঁহার সহিত কর্ণ, দুঃশাসন, শকুনি ত ছিলেনই, এমন কি এই অন্যায় কার্য্যে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতিও যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহারা বিরাটের গোয়ালা-দিগকে তাড়াইয়া বাট হাজার গাভী লইয়া প্রস্থান করিলেন।

এই সংবাদ রাজসভায় পঁহুছিতে বিলম্ব হইল না, কিন্তু সভা তখন প্রায় শূন্য। একমাত্র বিরাটের দ্বিতীয় পুত্র উত্তর ভিন্ন রাজ্যে আর কেহই ছিলেন না।

কৌরবগণের অত্যাচারের কথা শুনিয়া উত্তর স্ত্রীলোক-দিগের নিকট বাহাদুরী দেখাইবার জন্য এই বলিয়া দুঃখ করিতে লাগিলেন, 'হায় হায়, কি করি! উপযুক্ত সারথি কেহ নাই! ভাল একজন সারথি পাইলে, আমি এখনই গিয়া যুদ্ধে কৌরব-দল নির্ম্মূল করিয়া আসি।'

দ্রৌপদী নিকটেই ছিলেন। রাজপুত্রের সাহসের কথা শুনিয়া তাঁহার হাসি আসিল। অর্জ্জুনের সহিত গোপনে পরামর্শ করিয়া তিনি উত্তরের কাছে গিয়া বলিলেন, "রাজ-পুত্র, আপনার ভগিনী উত্তরা অনুরোধ করিলে, বৃহন্নলা আপনার সারথি হইতে পারেন। আমি জানি, খাণ্ডবদাহন-কালে এই বৃহন্নলাই অর্জ্জুনের সারথি ছিলেন।"

এই কথায় উত্তর আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "বৃহন্নলা সারথি হইবেন? তিনি যুদ্ধের কি বুঝেন? শেষে ভয় পাইয়া আমাকে শুদ্ধ বিপন্ন করিবেন না ত? আচ্ছা, দেখাই যাক্। উত্তরা, তুমি গিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া আন দেখি?"

দাদার অনুরোধে রাজকুমারী অর্জ্জুনের কাছে গিয়া বলিলেন, "ও বৃহন্নলা, আমার দাদা দুষ্ট কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইবেন। তোমাকে তাঁহার রথের সারথি হইতে হইবে। দাদা বলিয়াছেন, তিনি এমন যুদ্ধ করিবেন যে, কাহাকেও আর প্রাণ লইয়া ফিরিতে হইবে না।"

বালিকার সুমিষ্ট কথা শুনিয়া অর্জ্জুন বলিলেন, "তাই ত, এত বড় বীরের সারথি হওয়া কি আমার শোভা পায়! যাহা হউক, তুমি যখন বলিতেছ, আমিই সারথি হইব। কিন্তু তোমার দাদাকে গিয়া বল, যুদ্ধে জয়লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত আমি কোন মতেই রথ ফিরাইব না।"

উত্তরা বলিলেন, "সে আর বলিতে হইবে কেন? আমার দাদা কৌরবগণকে শেষ না করিয়া কখনই ফিরিবেন না! আর দেখ বৃহন্নলা, দাদার বাণে দুর্য্যোধন প্রভৃতি যখন মাটিতে পড়িয়া লুটাইবে, তখন তুমি তাহাদের পোষাকগুলি আনিতে ভুলিও না। তাহা দিয়া আমি পুতুল সাজাইব।"

রাজকুমার উত্তর স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, তাঁহাকে সত্য-সত্যই যুদ্ধে যাইতে হইবে, কিন্তু অর্জ্জুন যখন রথ সাজাইয়া প্রস্তুত হইলেন, তখন আর তাঁহার 'না' বলিবার উপায় রহিল না। মনে মনে ভয় থাকিলেও তিনি আড়ম্বরের সহিত যুদ্ধ-যাত্রা করিলেন। রথ বায়ুবেগে ছুটিতে লাগিল। পাণ্ডবেরা যে শমীগাছে আপনাদের অস্ত্রাদি লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, রথ সেখানে পঁহুছিলে, দূরে সাগরপরিমাণ কুরুসৈন্য

দেখিয়া উত্তরের মুখ শুকাইয়া গেল! তিনি ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "দোহাই বৃহন্নলা, রথ থামাও! তোমাকে অনেক টাকা-কড়ি, সোনা-দানা দিব, আমাকে ঘরে লইয়া যাও। বাপ্‌রে, আমি সাধ করিয়া আগুনে ঝাঁপ দিতে পারিব না!"

অর্জ্জুন বলিলেন, "সে কি রাজপুত্র, এত ভয় পাইলে লোকে বলিবে কি? গাভী না ছাড়াইয়া বাড়ী ফিরিলে, মেয়েরা যে বিদ্রূপ করিবেন! ছিঃ ছিঃ, ক্ষত্রিয় বীরের মুখে কি ও-কথা শোভা পায়?"

এত কাকুতি-মিনতিতেও অর্জ্জুন ঘোড়ার মুখ ফিরাইলেন না দেখিয়া, অগত্যা উত্তর রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া প্রাণপণে ছুটিতে লাগিলেন।

তখন অর্জ্জুন আর কি করেন। রাজকুমারকে আট্‌কাইতে না পারিলে সবই মাটি হয় জানিয়া তিনিও তাঁহার পিছন পিছন ছুটিলেন।

দূর হইতে এ ব্যাপার দেখিয়া ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি খুব আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। ভীষ্ম বলিলেন, "ঐ যে স্ত্রীলোকের মত বেণী দুলাইয়া ছুটিয়াছে, ও কে? অর্জ্জুন নয় ত? আমার কিন্তু সেইরূপ সন্দেহ হয়!" কৃপ বলিলেন, "নিশ্চিতই অর্জ্জুন! অর্জ্জুন ভিন্ন কাহার এত সাহস!" দ্রোণ বলিলেন, "ভীষ্ম, আজ অর্জ্জুনের হস্তে আমাদের কাহারও নিস্তার নাই!"

ইঁহাদের বাক্যে কর্ণ স্পর্দ্ধা করিয়া বলিলেন, "হইলই বা অর্জ্জুন! আজ আর উহাকে প্রাণ লইয়া ফিরিতে হইবে না।"

অর্জ্জুনের সন্ধান পাওয়াতে দুর্য্যোধনের ভারী আনন্দ! তিনি ভাবিয়াছিলেন, এখনও অজ্ঞাতবাসের কাল ফুরায় নাই। কিন্তু ভীষ্ম গণনা করিয়া বলিলেন, "পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের সময় ফুরাইয়া আরও কিছুদিন গত হইয়াছে।" এ কথায় দুর্য্যোধন সন্তুষ্ট হইলেন না।

এদিকে অর্জ্জুনের হাতে ধরা পড়িয়া উত্তর ত কাঁদিয়াই আকুল! অর্জ্জুন তাঁহাকে সাহস দিয়া বলিলেন, "ভয় নাই, আপনি স্থির হউন। আপনাকে যুদ্ধ করিতে হইবে না। আমি যুদ্ধ করিয়া গাভী ছাড়াইব। আপনি রথে বসিয়া সারথির কাজ করুন।"

এ কথায় উত্তর একটু আশ্বস্ত হইলে, অর্জ্জুন তাঁহাকে শমীগাছ দেখাইয়া বলিলেন, "রাজপুত্র, গাছে চড়িয়া ঐ অস্ত্রগুলি পাড়িয়া আনুন।"

যুদ্ধের ভয় গেল ত, তখন ভূতের ভয়েই উত্তর জড়-সড়! সে গাছে কি তিনি সহজে চড়িতে চান! অর্জ্জুন অনেক করিয়া সাহস দিলে তবে তিনি অস্ত্রগুলি পাড়িয়া আনিলেন। তার পর বাঁধন খুলিবামাত্র যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল। অস্ত্রের এমন তীব্র জ্যোতিঃ তিনি আর কখনও দেখেন নাই। রাজপুত্র কিছুক্ষণ অবাক্

হইয়া রহিলেন। শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৃহন্নলা, এরূপ ভয়ানক অস্ত্র আমি ত কোথাও দেখি নাই! এ কাহার অস্ত্র?"

অর্জ্জুন। এ সকল পাণ্ডবদের অস্ত্র। অজ্ঞাতবাসে যাইবার পূর্ব্বে তাঁহারা অস্ত্রগুলি এখানে লুকাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

উত্তর। তাহা তুমি জানিলে কিরূপে?

অর্জ্জুন। আমি যে তাঁহাদেরই একজন। আমার নাম অর্জ্জুন। 'কঙ্ক' নামে তোমার পিতার যিনি সভাসদ্, তিনিই যুধিষ্ঠির; 'বল্লব' নামে ঐ যে পাচকটি, উনিই ভীম; 'গ্রন্থিক' ও 'তন্ত্রিপাল—এই দুইজন নকুল ও সহদেব। আর লোকে যাঁহাকে 'সৈরিন্ধ্রী' বলিয়া জানে, প্রকৃতপক্ষে তিনিই দ্রৌপদী।

অর্জ্জুনের কথায় উত্তরের চক্ষু কপালে গিয়া ঠেকিল। 'এ কি অসম্ভব কথা! দেবতারাও যাঁহাদের সম্মান করেন, সেই মহাপুরুষেরা এই। এত সামান্য ভাবে তাঁহারা আমাদের বাড়ীতেই বাস করিতেছেন! উত্তরের সন্দেহ কিছুতেই দূর হইল না! তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, আপনি যদি তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন হন, বলুন দেখি, আপনার আর কি কি নাম আছে?"

তখন অর্জ্জুন বলিলেন, "আমার প্রধান নাম দশটি। যথা:—অর্জ্জুন, ধনঞ্জয়, বিজয়, কিরিটী, ফাল্গুনী, সব্যসাচী, বীভৎসু, শ্বেতবান, কৃষ্ণ ও বিষ্ণু। ইহা ছাড়া পৃথা বা কুন্তীদেবীর পুত্র বলিয়া লোকে আমাকে পার্থ বা কৌন্তেয় নামেও অভিহিত করে।"

এতক্ষণে উত্তরের সকল সন্দেহ দূর হইল। তিনি বার বার অর্জ্জুনের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। তার পর মহা উৎসাহে অশ্বের লাগাম ধরিয়া বসিলেন। দেখিতে দেখিতে রথ কৌরব-সৈন্যের নিকটস্থ হইল। অর্জ্জুন দেখিলেন, সৈন্যের দল চারিভাগে বিভক্ত; একভাগ দুর্য্যোধনকে লইয়া ব্যস্ত আছে, একভাগ গাভীগুলিকে বেষ্টন করিয়া আছে, আর বাকি দুইভাগ ভীষ্ম, দ্রোণ কৃপ প্রভৃতির অধীনে থাকিয়া সম্মুখ দিকে অগ্রসর হইতেছে।

বহুকাল পরে পিতামহ ভীষ্ম এবং অস্ত্রগুরু দ্রোণকে দেখিয়া অর্জ্জুনের হৃদয় ভক্তি ও শ্রদ্ধাতে পূর্ণ হইল। তিনি কয়েকটি বাণে তাঁহাদের চরণবন্দনা এবং আর কয়েকটি দ্বারা কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া, গাণ্ডীবের টঙ্কার ও দেবদত্ত বিশাল শঙ্খে ফুঁ দিলেন। অমনি ভয়ে সকলে কাঁপিয়া উঠিল।

তার পর ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। একদিকে একা অর্জ্জুন, অপরদিকে অগণ্য কৌরব-সৈন্য আর ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা প্রভৃতি বড় বড় যোদ্ধা।

কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, অর্জ্জুন যে দেব বলে বলী! কাহার সাধ্য তাঁহার অঙ্গে প্রহার করে! এদিকে অর্জ্জুনের বাণে রণস্থলে আগুন ছুটিতে লাগিল। শত সহস্র সৈন্য প্রাণ ত্যাগ করিল। বড় বড় রথীরা পর্য্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। যতক্ষণ অর্জ্জুন দূরে ছিলেন, কর্ণের গর্ব্বের সীমা ছিল না। এখন তাঁহার এমন দশা হইল যে, রুপু কষেরা ন্যায় রণস্থল

হইতে পলায়ন করিতেও তিনি লজ্জাবোধ করিলেন না! কর্ণ পলাইলে কৃপ আসিলেন। কৃপের পর দ্রোণাচার্য্য ও অশ্বত্থামা আসিলেন, কিন্তু কাহারও এমন শক্তি হইল না যে, অর্জ্জুনকে পরাস্ত করেন। বরং অর্জ্জুনের হস্তে পড়িয়া তাঁহারাই চারিদিক্ অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন!

দুর্য্যোধনের কথা আর কি বলিব। অর্জ্জুন দয়া করিয়া ছাড়িয়া না দিলে, সেই দিনই তাঁহার যুদ্ধের সাধ মিটিয়া যাইত! দুর্য্যোধনের অবস্থা দেখিয়া কর্ণ আবার আসিলেন, রক্তাক্ত দেহে আবার তাঁহাকে পলাইতে হইল! অন্যের কথা কি, ভীষ্ম যে এত বড় বীর, তিনিও অর্জ্জুনের সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিলেন না। শেষে সকলে মিলিয়া চারিদিক হইতে আক্রমণ করিয়াও কোনই ফল হইল না।

ব্যাপার দেখিয়া শত্রু-মিত্র সকলেই অবাক্! কৃপ বলিলেন, "দ্রোণ, আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই, এখন যে যাহার প্রাণ রক্ষার উপায় কর।"

এদিকে অর্জ্জুন ভাবিলেন, 'যে জন্য যুদ্ধের আয়োজন, বিপাকে পড়িয়া কৌরবেরা সেই গাভীগুলি ছাড়িয়া দিয়াছে। এখন বৃথা আর আত্মীয়-স্বজনকে বধ করিয়া কি লাভ!' এই ভাবিয়া তিনি 'সম্মোহন' অস্ত্রে সকলকে অজ্ঞান করিয়া ফেলিলেন। তার পর উত্তরকে বলিলেন, "এইবার তোমার ভগিনীর জন্য দ্রোণ, কর্ণ, দুর্য্যোধন প্রভৃতির পোষাক লইয়া এস। কিন্তু সাবধান, ভীষ্মের নিকট যাইও না!"

উত্তর ফিরিয়া আসিলে, অর্জ্জুন পূর্ব্বের ন্যায় বাণদ্বারা ভীষ্ম ও দ্রোণের চরণবন্দনা করিয়া এবং আর একটি বাণে দুর্য্যোধনের মুকুট কাটিয়া ফেলিয়া রথ ফিরাইবার আদেশ করিলেন। বিরাটের গাভীগুলি অগ্রেই বন্ধনমুক্ত হইয়াছিল! অর্জ্জুনের শঙ্খরবে উত্তেজিত হইয়া তাহারা লাফাইতে লাফাইতে বিরাটের গোয়ালে আসিয়া উপস্থিত হইল।

রথ পুনরায় শ্মশানের নিকট পঁহুছিলে, অর্জ্জুন উত্তরকে বলিলেন, "আমাদের কথা শুধু তুমিই জানিলে। সাবধান, অন্য কেহ যেন জানিতে না পারে।" এই বলিয়া অস্ত্রাদি পূর্ব্বের ন্যায় সেই শমীগাছে লুকাইয়া রাখিয়া তিনি আবার বৃহন্নলার বেশে সারথির আসনে বসিলেন।

ততক্ষণে কর্ণ, দুর্য্যোধন প্রভৃতি উঠিয়া বসিয়াছেন, আর বেজায় আস্ফালন আরম্ভ করিয়াছেন। ভীষ্মের ইহা সহ্য হইল না। তিনি বলিলেন, "এতক্ষণ তোমরা ছিলে কোথায়? তোমাদের বড় ভাগ্য যে, অর্জ্জুন যুদ্ধে আসিয়াছিল। অর্জ্জুন না আসিয়া যদি ভীম আসিত, তবে কাহাকেও আর ঘরে ফিরিতে হইত না।"

এদিকে রাজা বিরাট সুশর্ম্মাকে পরাজিত করিয়া গৃহে ফিরিয়াই শুনিলেন, রাজকুমার উত্তর বৃহন্নলাকে সারথি করিয়া ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি মহারথগণের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়াছেন। অমনি ভয়ে তাঁহার বুক কাঁপিয়া উঠিল। ব্যস্ত

হইয়া তিনি কেবলই এই কথা বলিতে লাগিলেন, 'হায় হায়! এতক্ষণে না জানি তাহার কি দশা হইয়াছে!'

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "মহারাজ, আপনি স্থির হউন! বৃহন্নলা কাছে থাকিতে কেহ কুমার উত্তরের কেশও স্পর্শ করিতে পারিবে না।"

কিন্তু একথায় কি পিতার মন শান্ত হয়? তিনি রাজ্যের সমুদয় সৈন্য জড় করিয়া তখনই যুদ্ধস্থলে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন।

ইতিমধ্যে দূত আসিয়া সংবাদ দিল, 'কৌরবগণকে পরাস্ত করিয়া রাজকুমার উত্তর সগৌরবে ফিরিয়া আসিতেছেন।'

আহা! রাজার মনে তখন কি আনন্দই হইল! দূতকে হাত ভরিয়া পুরস্কার দিয়া তিনি যুধিষ্ঠিরের সহিত পাশা খেলিতে বসিলেন। রাজ্যময় ধূমধাম আনন্দ উৎসব পড়িয়া গেল।

খেলিতে খেলিতে রাজা উৎসাহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা কঙ্ক, আজ আমার উত্তর যাহা করিয়াছে, আর কেহ তাহা পারে কি?"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "মহারাজ, যুদ্ধে যে জয়লাভ হইবে, ইহা ত জানা কথা। বৃহন্নলা যাহার সারথি, কাহার সাধ্য তাহাকে পরাস্ত করে? মানুষ ত দূরের কথা, বৃহন্নলার হস্তে দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ, কাহারও নিস্তার নাই!" যুধিষ্ঠিরের কথায় রাজা বিরাট একটু যেন অপ্রসন্ন হইলেন।

খেলা খুব উৎসাহের সহিত চলিতে লাগিল। বিরাট আবার পুত্রের বীরত্বের কথা উত্থাপন করিলে, যুধিষ্ঠির বলিলেন, "মহারাজ, বৃহন্নলা সঙ্গে ছিলেন বলিয়াই ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি মহারথগণকে পরাস্ত করা সম্ভব হইয়াছে।" এইরূপে রাজা যখনই উত্তরের নাম করেন, যুধিষ্ঠিরও তখনই বৃহন্নলার প্রশংসা করিতে থাকেন। ক্রমে বিরাটের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। রাগে গর্-গর্ করিতে করিতে তিনি পাশা ছুড়িয়া যুধিষ্ঠিরের মুখে আঘাত করিলেন।

অমনি তাঁহার নাক দিয়া দর-দর ধারে রক্ত পড়িতে লাগিল। সে রক্ত আপনার অঞ্জলিতে ধরিয়া যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে বলিলেন, "জল আনিয়া ক্ষতস্থান ধৌত কর।"

হঠাৎ এই সময় কুমার উত্তর সভায় প্রবেশ করিলেন।

যুধিষ্ঠিরের দিকে চাহিয়াই তিনি ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "বাবা, কি সর্ব্বনাশ! শীঘ্র ইঁহাকে প্রসন্ন করুন। নচেৎ আমাদের আর রক্ষা নাই!"

পুত্রের কথায় বিরাট যুধিষ্ঠিরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। যুধিষ্ঠির বলিলেন, "মহারাজ, আপনি নিশ্চিন্ত হউন! আমি কিছুমাত্র রুষ্ট হই নাই।"

রাজকুমারের সহিত অর্জ্জুনকে না দেখিয়া যুধিষ্ঠির বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা ছিল, যে কেহ যুধিষ্ঠিরের অঙ্গের শোণিতপাত করিবে, তাহাকেই তিনি যমালয়ে পাঠাইবেন। সেই কথা মনে করিয়াই যুধিষ্ঠির ভয়ে ভয়ে

অঞ্জলি পাতিয়া সমস্ত রক্ত ধরিয়াছিলেন। অর্জ্জুন আসিয়া তাঁহার নাকের রক্ত দেখিলে, বিরাটের আর রক্ষা থাকিত না। অর্জ্জুন যে আসেন নাই, ইহা ভগবানের শুভ ইচ্ছা।

তার পর রাজা বিরাট পুত্রকে বুকে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "বাবা, ধন্য তোমার সাহস! এতগুলি বড় বড় বীরকে হারাইয়া দেওয়া কি সহজ কথা! আজ সত্য সত্যই, তুমি আমার বংশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছ।"

উত্তর বলিলেন, "না বাবা, আসল ঘটনা তাহা নহে। আমি শুধু রথ চালাইয়াছি। এক দেবপুত্রের কৃপাতেই এই অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে। দুষ্ট কৌরবগণকে তিনি এমন শিক্ষা দিয়াছেন যে, সহজে তাহারা আর এদিকে ঘেঁসিবে না।"

বিরাট। তিনি কোথায়? সঙ্গে করিয়া আনিলে না কেন? ইঁহার পায়ের ধূলা লইয়া আমরা ধন্য হইতাম।

উত্তর। দুই এক দিনের মধ্যেই তিনি আসিবেন।

সেই দিনই পাণ্ডবেরা গোপনে পরামর্শ করিলেন যে, আর লুকাইয়া না থাকিয়া শীঘ্রই তাঁহারা নিজেদের পরিচয় দিবেন। এ কথা উত্তরের জানিতে বাকী থাকিল না।

নির্দ্দিষ্ট দিনে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রাজবেশে সজ্জিত হইয়া বিরাটের সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। তাঁহার বামদিকে দ্রৌপদী এবং উভয় পার্শ্বে ছত্র, দণ্ড ও চামর হস্তে ভীম, অর্জ্জুন প্রভৃতি দাঁড়ান। ব্যাপার দেখিয়া রাজা বিরাট শুধু যে আশ্চর্য্য হইলেন, তাহা নহে, নিতান্ত বিরক্তও হইলেন।

তিনি কঠোর ভাষায় যুধিষ্ঠিরকে ডাকিয়া বলিলেন, "কঙ্ক, এ তোমাদের কিরূপ ব্যবহার! ভাল লোক মনে করিয়া আমি তোমাদিগকে আশ্রয় দিয়াছিলাম; আজ কি না, সিংহাসনে বসিয়া আমাকে অপমান করিতেও তোমাদের লজ্জা হইল না।"

তখন অর্জ্জুন বলিলেন, "মহারাজ, সহসা এরূপ বিচলিত হইবেন না। সুরপতি ইন্দ্রও যাঁহাকে আসন দিতে পারিলে মনে মনে গৌরব অনুভব করেন, সেই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আজ আপনার সিংহাসনে উপবিষ্ট!"

যুধিষ্ঠিরের নাম শুনিয়া রাজা চমকিত হইলেন। তখন রাজকুমার উত্তর একে একে সকলের পরিচয় দিয়া শেষে অর্জ্জুনকে দেখাইয়া বলিলেন, "আমি যে দেবপুত্রের কথা বলিয়াছিলাম, ইনিই সেই বীর, ইঁহার নাম অর্জ্জুন।"

পুত্রের মুখে সকল কথা শুনিয়া বিরাট আনন্দে অধীর হইয়া উঠিলেন। বীরত্বে, চরিত্রে ও বংশগৌরবে যে পাণ্ডবগণ জগতের পূজ্য, ছদ্মভাবে বৎসরাধিক কাল তাঁহারা তাঁহার গৃহ পবিত্র করিয়াছেন, এ কি কম সৌভাগ্যের কথা! রাজা কি বলিয়া যে আনন্দ প্রকাশ করিবেন, তাহার ভাষা খুঁজিয়া পাইলেন না।

তখন যুধিষ্ঠির বলিলেন, "মহারাজ, নিতান্ত সঙ্কটকালে আশ্রয় দিয়া আপনি আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন। শিশু যেমন মায়ের কোলে নির্ভয়ে থাকে, আমরাও তেমনি নিশ্চিন্ত

ভাবে এখানে বাস করিয়াছি। সে কথা স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞতায় আমাদের হৃদয় ভরিয়া উঠিতেছে।"

যুধিষ্ঠিরের বাক্যে সকলের চক্ষে জল আসিল।

অবশেষে রাজা বিরাট অর্জ্জুনকে স্নেহালিঙ্গন করিয়া তাঁহার সহিত কুমারী উত্তরার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। সে কথায় অর্জ্জুন বলিলেন, "মহারাজ, এই এক বৎসর কাল আমি যাহাকে কন্যার ন্যায় স্নেহ করিয়াছি এবং যে আমাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিয়াছে, তাহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করা আমার পক্ষে কোন মতেই শোভা পায় না। বরং তাহাকে পুত্রবধূ হইতে দেখিলে আমি অত্যন্ত সুখী হইব। আমার অভিমন্যুই তাহার উপযুক্ত বর।"

এ প্রস্তাবে কাহার আপত্তি হইতে পারে? অমনি দেশে দেশে দূত প্রেরিত হইল। পাণ্ডবেরা এখনও বাঁচিয়া আছেন এবং কুশলে আছেন জানিয়া আত্মীয়স্বজন সকলেই আনন্দিত হইলেন। ক্রমে এক এক করিয়া বহু রাজা বিরাট নগরে উপস্থিত হইলেন। পাঞ্চাল হইতে দ্রুপদ, দৃষ্টদ্যুম্ন; দ্বারকা হইতে কৃষ্ণ বলরাম প্রভৃতি সকলেই আসিলেন। তার পর শুভদিন দেখিয়া মহা সমারোহে উত্তরা ও অভিমন্যুর শুভ-বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল।

উদ্যোগপর্ব্ব

এক বিবাহের পর যুধিষ্ঠির যাহাতে তাঁহার রাজ্য ফিরিয়া পান, সে বিষয়ে পরামর্শ করিবার জন্য বিরাটের গৃহে বড় বড় রাজা ও যোদ্ধাদের এক মহাসভা হইল।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "বার বৎসর বনবাস এবং এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিয়া পাণ্ডবেরা তাঁহাদের প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছেন। এখন ন্যায়তঃ তাঁহারা অর্দ্ধেক রাজ্যের অধিকারী। দুর্যোধন যদি সহজে রাজ্য ছাড়িয়া দেয়, ভালই; নচেৎ যুদ্ধ করিয়া রাজ্য লইতে হইবে এবং সেই যুদ্ধে আমরা সকলেই পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করিব। কিন্তু যাহাতে শান্তভাবে কার্য্যসিদ্ধি হয়, অগ্রে সেই চেষ্টাই কর্ত্তব্য; অতএব হস্তিনায় দূত পাঠান হউক।"

এ কথায় রাজা দ্রুপদ বলিলেন, "দুর্য্যোধন যেরূপ প্রকৃতির লোক, তাহাতে আমাদিগকে বিশেষ সতর্কভাবে কার্য্য করিতে হইবে! অগ্রে সংবাদ পাইলে সে দেশে দেশে চর পাঠাইয়া সকলকেই নিজের দলে টানিতে চেষ্টা করিবে। দুর্য্যোধনের চক্রে পড়িয়া একবার কথা দিলে, শেষে কেহই আর পাণ্ডব-পক্ষ অবলম্বন করিতে পারিবেন না। সেই জন্য আমার প্রস্তাব এই যে, দুর্য্যোধনের নিকটেও দূত যাক এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য রাজা-মহারাজগণকেও সংবাদ দেওয়া হউক।"

পাঞ্চালরাজের এই যুক্তিপূর্ণ প্রস্তাবে সকলেই একমত হইলেন। ইহার পর অর্দ্ধরাজ্য চাহিয়া হস্তিনায় দূত পাঠান হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য রাজ্যসমূহেও দূত পাঠাইবার ব্যবস্থা হইল। সভাভঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ, দ্রুপদ, বলরাম প্রভৃতি আপন আপন দেশে চলিয়া গেলেন।

যথাকালে হস্তিনা হইতে দূত ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল যে, যুদ্ধ ব্যতীত দুর্য্যোধন তিল-পরিমাণ রাজ্যও ছাড়িবেন না। ইহার পর দুই পক্ষই বলসঞ্চয়ে বিশেষ মনোযোগী হইলেন। তাঁহাদের চেষ্টায় ক্রমে দলে দলে রাজা ও যোদ্ধা আসিয়া এক এক পক্ষে যোগ দিতে লাগিলেন।

এই সংক্রান্তে মদ্ররাজ শল্যকে লইয়া বেশ একটু গোল-যোগ বাধিল। সম্পর্কে তিনি পাণ্ডবদের মামা; তাঁহাদের সাহায্যের জন্য বিস্তর সৈন্য লইয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু পথে দুর্য্যোধন তাঁহাকে কৌশলে হাত করিয়া ফেলিলেন! তাঁহার আর পাণ্ডবপক্ষে যোগ দেওয়া হইল না। বিরাটে পৌঁছিয়াই সে কথা তিনি যুধিষ্ঠিরকে জানাইলেন। তখন ধর্ম্মরাজ বলিলেন, "মামা, আপনি যখন দুর্য্যোধনের ফাঁদে ধরা পড়িয়াছেন, তখন আর উপায় কি! কিন্তু আমার একটি প্রার্থনা আছে; কর্ণের সহিত যখন অর্জ্জুনের যুদ্ধ বাধিবে, তখন কর্ণের রথের সারথি হইয়া আপনাকে এমন উপায় করিতে হইবে যে, সে যেন একটু নিস্তেজ হইয়া পড়ে।"

শল্য বলিলেন, "সে কথা বলাই বাহুল্য। তোমাদের যাহাতে উপকার হয়, আমি যথাসাধ্য সেই চেষ্টাই করিব।"

শল্যকে নিজের দলে আনিতে পারিয়া দুর্য্যোধনের উৎসাহ খুব বাড়িয়া গেল। এইবার শ্রীকৃষ্ণকে হাত করিতে পারিলেই তাঁহার সাধ মিটে। তাহা হইলে আর যুদ্ধের এত শত আয়োজনের কোন প্রয়োজনই থাকে না।

মনে মনে এই ফন্দী আঁটিয়া দুর্য্যোধন ত চুপি চুপি রওনা হইলেন। কিন্তু হায়, অর্জ্জুন তাঁহার সকল সাধেই বাদ সাধিলেন। দুর্য্যোধন দ্বারকায় পঁহুছিতে না পঁহুছিতে অর্জ্জুনও সেখানে গিয়া উপস্থিত!

কৃষ্ণ তখন ঘুমাইতেছিলেন। সুতরাং উভয়কেই কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল। দুর্য্যোধনের মান-মর্য্যাদা বেশী, তাই তিনি বসিলেন কৃষ্ণের মাথার কাছে আর অর্জ্জুন বসিলেন তাঁহার পায়ের দিকে।

ঘুম ভাঙ্গিলে কৃষ্ণের চক্ষু অগ্রে অর্জ্জুনের উপরেই পড়িল, তার পর অবশ্য তিনি দুর্য্যোধনকেও দেখিতে পাইলেন। হঠাৎ এ ভাবে দেখা দিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, দুর্য্যোধন বলিলেন, "যুদ্ধে আমার দলে যোগ দিবার জন্য আপনাকে বরণ করিতে আসিয়াছি। কৌরব ও পাণ্ডবদিগের সহিত আপনার একই সম্বন্ধ, কিন্তু আমি আগে আসিয়াছি, সেই জন্য আমার দলেই যোগ দেওয়া আপনার উচিত।"

কৃষ্ণ বলিলেন, "তুমি অগ্রে আসিলেও আমি অর্জ্জুনকেই

অগ্রে দেখিয়াছি। যাহা হউক, আমি তোমাদের দুই জনকেই সাহায্য করিব। একদিকে আমার দশ কোটি নারায়ণী-সেনা থাকিবে, অপরপক্ষে আমি নিজে যোগ দিব, কিন্তু অস্ত্রও ধরিব না, যুদ্ধও করিব না। এখন তোমাদের মধ্যে যাহার যাহা ইচ্ছা, লইতে পার। অর্জ্জুন বয়সে ছোট সেই জন্য তাহার প্রার্থনা অগ্রে পূর্ণ করিব।"

এ কথায় অর্জ্জুন বলিলেন, "আমি সৈন্য চাহি না, তোমাকেই চাই।" শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "তথাস্তু।"

দুর্য্যোধন ভাবিলেন, 'ভালই হইল। দশ কোটি নারায়ণী-সেনা পাইলে আমার অনেক লাভ।' শ্রীকৃষ্ণের প্রস্তাবে উভয়েই সন্তুষ্ট হইয়া গৃহে ফিরিলেন।

ক্রমে ক্রমে দ্রুপদ, বিরাট, জরাসন্ধের পুত্র জয়ৎসেন, শিশুপালের পুত্র ধৃষ্টকেতু, যদুবংশের অসাধারণ যোদ্ধা সাত্যকি, মহাবীর পাণ্ড্য প্রভৃতি বহু নরপতি অসংখ্য সৈন্যসহ আসিয়া পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিলেন। আর স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জ্জুনের রথের সারথির পদ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। ইহার উপর আবার ভীমের পুত্র ঘটোৎকচ দুই কোটি রাক্ষস সেনা প্রস্তুত করিয়া রাখিল।

আর কৌরবপক্ষে চন্দ্রবংশের ভূরিশ্রবা, কামরূপের ভগদত্ত, যদুবংশের কৃতবর্ম্মা, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, মদ্ররাজ শল্য, কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ প্রভৃতি মহারথগণ সসৈন্য আসিয়া যোগদান করিলেন।

২১৮৭০টি হস্তী, ২১৮৭০টি রথ, ৬৫৬১০টি অশ্ব এবং ১০৩৫০ জন পদাতি লইয়া এক অক্ষৌহিণী হইয়া থাকে। পাণ্ডবপক্ষে এইরূপ সাত অক্ষৌহিণী এবং কৌরবপক্ষে এগার অক্ষৌহিণী সৈন্য সংগৃহীত হইল।

যুদ্ধের সকল আয়োজনই প্রস্তুত, কিন্তু যুধিষ্ঠির তখনও সন্ধির আশা পরিত্যাগ করেন নাই। গোলযোগ মিটাইবার জন্য দ্রুপদের পুরোহিতকে হস্তিনায় পাঠাইয়া তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, 'দুর্য্যোধন আমাদের সর্ব্বস্ব গ্রাস করিতে চাহিলেও, অন্ধরাজ কখন এত বড় অবিচার সহ্য করিবেন না। ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর বাঁচিয়া থাকিতে দেশশুদ্ধ লোক কাটাকাটি করিয়া মরিবে, ইহা কি সম্ভব?'

কল্পনায় তিনি এইরূপ নানা কথা ভাবিতে লাগিলেন; কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। পুরোহিত ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "সন্ধির আশা মিথ্যা। দুর্য্যোধন প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, বিনা যুদ্ধে রাজ্যের এক তিল-পরিমাণ ভূমিও ছাড়িবে না! হয়, সে আপনাদিগকে মারিয়া রাজ্য নিরাপদ করিবে, না হয়, আপনাদের হস্তে প্রাণ দিবে। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুর এবং স্বয়ং অন্ধরাজ শত প্রকারে বুঝাইয়াও তাহার এই কু-অভিসন্ধি দূর করিতে পারেন নাই।"

দুর্য্যোধনের প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া, অতঃপর কি কর উচিত, স্থির করিবার জন্য যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে আনিতে পাঠাইলেন। ইতিমধ্যে হস্তিনা হইতে সঞ্জয় আসিয়া

বলিলেন, "ধৃতরাষ্ট্র সন্ধিস্থাপনে প্রস্তুত, কিন্তু তাঁহার পুত্রগণ যুদ্ধের জন্য ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। বিনা যুদ্ধে তাহারা কখনই রাজ্যভাগ প্রদান করিবে না।"

ততক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া পঁহুছিয়াছেন। সঞ্জয়ের কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, তাহাই হইবে। পাণ্ডবগণও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত আছেন।"

সঞ্জয় ফিরিয়া গেলে, পাণ্ডবদের দল-বলের কথা জানিতে পারিয়া এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের রথে সারথি হইবেন শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত ভয় পাইলেন। তাঁহার বুঝিতে বাকি রহিল না যে, দুর্য্যোধনের দর্প চূর্ণ হইতে আর বিলম্ব নাই। তখন নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া তিনি সন্ধির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুর্য্যোধনের মুখে সেই একই কথা—'হয়, পাণ্ডবদিগকে বিনাশ করিয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করিব, না হয়, তাহাদের হস্তে প্রাণ দিব। কোন মতেই সন্ধি করিব না।' পুত্রের নির্ব্বুদ্ধিতা দেখিয়া অন্ধরাজ 'হায়' 'হায়' করিতে লাগিলেন।

ভীষ্মের প্রাণেও দারুণ আঘাত লাগিল। তিনি বলিলেন, "দুর্য্যোধন, কাহার ভরসায় তুমি যুদ্ধের আয়োজন করিতেছ? কর্ণ মুখে যত গর্ব্বই করুক, তাহার বীরত্ব জানিতে কাহারও বাকি নাই। গন্ধর্ব্ব-যুদ্ধের কথা কি তুমি ভুলিয়া গিয়াছ? কর্ণ যখন তোমায় বন্দী দশায় ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছিল, তখন তাহার বীরত্ব ছিল কোথায়? অনেক দিনের কথা নয়,

বিরাটের গাভী হরণ করিতে গিয়া অর্জ্জুনের হস্তে আমাদের সকলকে—বিশেষতঃ কর্ণকে—যে কি পর্য্যন্ত নাকাল হইতে হইয়াছিল, তাহা কি তোমার মনে নাই? তাই বলি, এখনও পরিণাম চিন্তা করিয়া সুপথ অবলম্বন কর। পাণ্ডবদের ন্যায্য প্রাপ্য ফিরাইয়া দিয়া ভাই ভাই এক হইয়া যাও।"

দ্রোণ, কৃপ, বিদুর প্রভৃতি গুরুজনেরাও দুর্য্যোধনকে বার বার বুঝাইতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি কাহারও কথা গ্রাহ্য করিলেন না।

ইহার পর স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ সন্ধির প্রস্তাব লইয়া কৌরব-সভায় উপস্থিত হইলেন এবং দুর্য্যোধনকে নানাভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। কৃষ্ণ বলিলেন, "আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, এ যুদ্ধের ফল বড়ই ভীষণ। কুরুবংশ যাহাতে রক্ষা পায়, এখনও তাহার উপায় কর। অর্দ্ধরাজ্য না দাও, পাঁচ ভাইকে সামান্য পাঁচখানি গ্রাম ছাড়িয়া দাও। পাণ্ডবেরা তাহাতেই সন্তুষ্ট হইবেন।"

শ্রীকৃষ্ণের কথায় দুর্য্যোধন স্পর্দ্ধা করিয়া বলিলেন, "বিনা যুদ্ধে আমি সূচ্যগ্র পরিমাণ স্থানও ছাড়িব না।"

ইহা শুনিয়া ভয়ে ধৃতরাষ্ট্রের আপাদমস্তক কাঁপিতে লাগিল। নিতান্ত নিরুপায় হইয়া তিনি অন্তঃপুর হইতে গান্ধারীকে আনাইলেন। কিন্তু হায়, মাতার সহস্র কাতর অনুনয়েও দুর্য্যোধন কর্ণপাত করিলেন না। তাঁহার চক্ষের জলেও কু-পুত্রের কঠিন হৃদয় বিগলিত হইল না!

পিতা, মাতা প্রভৃতি গুরুজন, এমন কি শ্রীকৃষ্ণের প্রতিও অবজ্ঞার ভাব দেখাইয়া দুর্য্যোধন সভাগৃহ পরিত্যাগ করিলেন এবং কর্ণ, শকুনি প্রভৃতি দুষ্টজনের সহিত মিলিয়া কৃষ্ণকে বন্দী করিবার পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

এ কথা জানিতে পারিয়া ভীষ্ম অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, "তোমার পুত্রের নিতান্তই মতিভ্রম ঘটিয়াছে। সে যদি কৃষ্ণের প্রতি কোনরূপ অসম্মান দেখায় অথবা অত্যাচার করে, তবে জানিও, পৃথিবীর সকল শক্তি মিলিত হইলেও তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না!"

শ্রীকৃষ্ণ তখন বলিলেন, "আমার জন্য আপনারা ব্যস্ত হইবেন না। কুরুসভায় উপস্থিত হইয়া দুর্য্যোধনের ব্যবহারে আমি অবাক্ হইয়াছি। এই দুষ্টকে শাসন করা যদি আপনাদের পক্ষে অসম্ভব হয়, তবে বলুন, আমি ইহাকে বন্ধন করিয়া যুধিষ্ঠিরের হস্তে সমর্পণ করি। তদ্ভিন্ন কুরুকুল রক্ষার আর উপায় নাই।"

কৃষ্ণের এই সঙ্গত প্রস্তাব ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর সকলেই অনুমোদন করিলেন, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র চুপ করিয়া রহিলেন।

ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "মরণকালে লোকের বিপরীত বুদ্ধিই হইয়া থাকে। যাহা হউক, আর এখানে বসিয়া সময় নষ্ট করা বৃথা। আমি যুধিষ্ঠিরের নিকট চলিলাম।"

সভা পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে কৃষ্ণ এমন ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি

ধারণ করিলেন যে, ভয়ে, সকলে 'ত্রাহি' 'ত্রাহি' ডাক ছাড়িতে লাগিল। দুর্য্যোধনের এমন সাহস হইল না যে, তাঁহার নিকট আসেন।

ইহার পর শ্রীকৃষ্ণ কুন্তীদেবীর সহিত দেখা করিয়া বলিলেন, "পিসিমা, সন্ধি-স্থাপনের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে, এখন যুধিষ্ঠিরকে আপনি কি উপদেশ দিতে চান, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি।"

কুন্তী বলিলেন, "বৎস আমি ক্ষত্রিয়-রমণী! সুতরাং উপদেশ যাহা দিব, তাহা কি আর বলিতে হইবে! আমার সন্তানগণ বনে বনে বিতাড়িত হইয়া ঘৃণিত জীবন যাপন করিতেছে, ইহা ইহা আর সহ্য হয় না। তের বৎসর অতীত হইয়াছে; তাহাদিগকে বলিবে, ইন্দ্রপ্রস্থের সুখের দিনের কথা স্মরণ করিয়া, সভামাঝে দ্রৌপদীর নিগ্রহের কথা স্মরণ করিয়া, সকলেরই যেন ক্ষত্রিয়-তেজ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে এবং অতুল বিক্রমে অধর্ম্মের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। সেই যুদ্ধে যদি কাহারও প্রাণ যায়, তাহাতেও আমি বিন্দুমাত্র দুঃখিত হইব না। কিন্তু আমি জানি, ভগবানের আশীর্ব্বাদে আমার পুত্রগণ অক্ষত শরীরেই জয় লাভ করিবে।" কুন্তীদেবীর এই উৎসাহবাক্যে কৃষ্ণের হৃদয় গর্ব্বে ভরিয়া গেল।

হস্তিনা হইতে ফিরিবার পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ কর্ণকে ডাকিয়া পাণ্ডবদের সহিত তাঁহার কি সম্পর্ক, তাহা বুঝাইয়া দিলেন এবং ভাইদের সহিত মিলিত হইয়া অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

করিতে অনুরোধ করিলেন। কর্ণ স্থির চিত্তে সকল কথা শুনিয়া শেষে বলিলেন, "হে কৃষ্ণ, কুন্তীদেবী কখনও আমার প্রতি মায়ের কর্ত্তব্য পালন করেন নাই। সকলে আমাকে রাধার পুত্র বলিয়া জানে এবং আমিও তাহাতেই সন্তুষ্ট; দুর্য্যোধনকে ভরসা দিয়া আজ যদি তাহাকে পরিত্যাগ করি, তবে লোকে আমাকে নিতান্ত অপদার্থ জ্ঞান করিবে; অতএব আমাকে এমন অন্যায় অনুরোধ করিও না।"

শ্রীকৃষ্ণ চলিয়া যাইবার পর স্বয়ং কুন্তীদেবী নির্জ্জনে কর্ণের সহিত দেখা করিয়া নানা প্রকারে তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। চোখের জলে জননীর বুক ভাসিতে লাগিল, তথাপি কর্ণ কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তিনি বলিলেন, "কৃষ্ণের মুখে আমি সকল কথাই শুনিয়াছি। কিন্তু আপনি কি ভুলিয়াও কখন আমার প্রতি মায়ের কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন? আজ যে আমার কাছে আসিয়াছেন, তাহাও শুধু যুধিষ্ঠিরের উপকারের জন্য। যাহা হউক, আপনাকে অমান্য করিতে চাহি না। দুর্য্যোধনকে কথা দিয়াছি; জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তাহার পক্ষ হইয়াই যুদ্ধ করিব! আমি শুধু এইটুকু বলিতে পারি যে, যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও সহদেব—ইহাদের কাহাকেও বধ করিব না। কিন্তু অর্জ্জুনের কথা স্বতন্ত্র! আপনি নিশ্চিন্ত জানিবেন, বাগে পাইলে অর্জ্জুনকে আমি কখনই ছাড়িব না। যদি নিতান্তই তাহাকে মারিতে না পারি, তবে তাহারই হস্তে প্রাণ দিব। সুতরাং

হয় আমাকে লইয়া, না হয়, অর্জ্জুনকে লইয়া আপনার পাঁচ পুত্রই জীবিত থাকিবে।”

কুন্তী আর কি বলিবেন? চোখের জল মুছিতে মুছিতে বিদুরের গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

যুদ্ধ যাহাতে না হয়, সে বিষয়ে চেষ্টার কোনই ত্রুটি হইল না, কিন্তু একা দুর্য্যোধন সকল চেষ্টাই ব্যর্থ করিয়া দিলেন। পাণ্ডবদিগকে সামান্য পাঁচ খানি গ্রাম দিতেও যখন তিনি রাজী হইলেন না, তখন যুদ্ধ ভিন্ন আর উপায় কি?

ইহার পর পাণ্ডবপক্ষের সাত অক্ষৌহিণী এবং কৌরব পক্ষের এগার অক্ষৌহিণী সেনা কুরুক্ষেত্রের বিস্তীর্ণ প্রান্তরের পূর্ব্ব ও পশ্চিমাংশে শিবির স্থাপন করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিল! অসংখ্য তাঁবু ও নিশানে মাঠের দৃশ্য একেবারে বদ্‌লাইয়া গেল।

পাণ্ডবপক্ষে বিরাট, দ্রুপদ, সাত্যকি, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, শিখণ্ডী ও ভীমসেন—এই সাত জন হইলেন সেনাপতি; ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রধান সেনাপতি এবং অর্জ্জুন পরিচালক। সকলের উপর মন্ত্রণাদাতা রহিলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ।

যুদ্ধ যখন কিছুতেই নিবারিত হইল না, তখন ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি বিষম সমস্যায় পড়িলেন। চিরদিনই তাঁহারা কুরু-রাজ্যের অন্নে পালিত। এই বিপদ্‌কালে প্রতিপালকের পক্ষ ত্যাগ করিলে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে হয়। আবার পাণ্ডবদের বিরুদ্ধেই বা অস্ত্রধারণ করেন কিরূপে? যাহা হউক, অনেক

বিবেচনার পর শেষে তাঁহারা কৌরবপক্ষে যোগ দেওয়াই সঙ্গত মনে করিলেন।

ভীষ্মকে স্বপক্ষে পাইয়া দুর্য্যোধন উৎসাহে মাতিয়া উঠিলেন। নিজে ইচ্ছা করিয়া না মরিলে যাঁহার মৃত্যু নাই, এমন বীর সহায় থাকিতে আর কাহাকে ভয়? দুর্য্যোধন তাঁহাকে সেনাপতিত্বে বরণ করিলেন।

তখন ভীষ্ম বলিলেন, "যে কয়দিন বাঁচিয়া থাকি, আমি তোমার পক্ষ হইয়াই যুদ্ধ করিব। কিন্তু যাহার কুপরামর্শে তুমি সর্ব্বস্ব হারাইতে বসিয়াছ, মহারথগণের মধ্যে যাহাকে আমি অর্দ্ধরথ ভিন্ন আর কিছুই মনে করি না, সেই কর্ণের সহিত একত্র যুদ্ধ করা আমার পক্ষে অসম্ভব।"

এ কথা শুনিয়া কর্ণ বলিলেন, "পিতামহ ভীষ্ম বাঁচিয়া থাকিতে এ যুদ্ধে আমি অস্ত্র ধরিব না।"

কর্ণ চলিয়া গেলে ভীষ্ম বলিলেন, "আমার কাছে কৌরবে ও পাণ্ডবে কোনই প্রভেদ নাই। তোমরাও যেমন আমার স্নেহের পাত্র, তাহারাও ঠিক তেমনি। সেই জন্য যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাঁচ ভাইকেও আমি বধ করিতে পারিব না। আর শিখণ্ডীর দেহে অস্ত্রপ্রহার করাও আমার পক্ষে সম্ভব নহে। কারণ, আমি জানি, পূর্ব্বজন্মে সে স্ত্রীলোক ছিল। এই ছয় জন ভিন্ন পাণ্ডবপক্ষের রথী, মহারথ কাহাকেও আমি সহজে ছাড়িব না। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, প্রত্যহ তাহাদের অন্যূন দশ হাজার সৈন্য যমালয়ে পাঠাইব।"

পিতামহের বাক্যে উৎসাহিত হইয়া দুর্য্যোধন উলূককে ডাকিয়া বলিলেন, "যাও, পাণ্ডবদিগকে এমন গালি দিয়া আসিবে যেন কলাই তাহারা যুদ্ধ আরম্ভ করে।"

উলূক শকুনিরই উপযুক্ত পুত্র। সুতরাং তাহাকে কোন কথাই শিখাইবার প্রয়োজন হইল না। সে পাণ্ডব-শিবিরে গিয়া সকলকে এমন উত্তেজিত করিয়া আসিল যে, পরদিনই যুদ্ধের ডঙ্কা বাজিয়া উঠিল।

যুদ্ধার্থে উভয় দলই ব্যগ্র, এমন সময় দুর্য্যোধন আসিয়া একে একে ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, আপনারা কে কতদিনে সমস্ত পাণ্ডবসৈন্য নিঃশেষে ধ্বংস করিতে পারেন ?"

এ কথায় ভীষ্ম বলিলেন, "খুব যত্ন করিয়া যুদ্ধ করিলে আমি এক মাসেই শেষ করিতে পারি।"

দ্রোণ বলিলেন, "আমারও প্রায় একমাসই লাগে।"

কৃপ বলিলেন, "আমি দুই মাসের কমে পারি না।"

অশ্বত্থামা বলিলেন, "আমি সোজা হয় দশ দিনেই পারি।"

কর্ণ বলিলেন, "আমার পক্ষে পাঁচ দিনই যথেষ্ট !"

কর্ণের স্পর্দ্ধা দেখিয়া ভীষ্মের হাসি আসিল। তিনি বলিলেন, "এখনও কি না কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের হাতে পড় নাই, তাই তোমার এত সাহস !"

চরের মুখে এই সংবাদ পাইয়া যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতির কথা ত শুনিলে !

আচ্ছা, সমস্ত কৌরবসৈন্য একেবারে শেষ করিতে তোমার কত দিন লাগে ?”

অর্জ্জুন বলিলেন, “কৃষ্ণ যখন সহায়, তখন আর দিনের আবশ্যক কি ? এক মুহূর্ত্তেই আমি সব শেষ করিতে পারি। আমার কাছে শিবের যে ‘পাশুপত’ অস্ত্র আছে, তাহা দ্বারা শুধু কৌরবসৈন্য কেন, সমস্ত সৃষ্টি লোপ করিতেও এক নিমেষের বেশী সময় লাগে না। কিন্তু এই সামান্য যুদ্ধে সে অস্ত্র ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। আমরা সহজ ভাবেই যুদ্ধ করিব। জয়লাভ-বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।”

ইহার পর সুন্দর শ্বেত বসন-ভূষণে সজ্জিত হইয়া উভয় পক্ষের সেনাপতিগণ আপন আপন স্থান অধিকার করিলেন। তূর্য্য ও দুন্দুভি-ধ্বনিতে দশদিক্ টল্‌মল্ করিতে লাগিলেন।

যুদ্ধ নিবারণের জন্য ব্যাসদেব ব্যস্ত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের সহিত দেখা করিলেন; কিন্তু যখন শুনিলেন, দুর্য্যোধন সকলের কথা অগ্রাহ্য করিয়া এই আগুন জ্বালাইয়াছেন, তখন কুরুবংশের পরিণাম চিন্তা করিয়া তিনি যার-পর-নাই দুঃখিত হইলেন।

ফিরিয়া যাইবার পূর্ব্বে মহর্ষি ধৃতরাষ্ট্রকে অনেক করিয়া সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, “অদৃষ্টে যাহা আছে, হইবেই; তুমি আর বৃথা শোক করিও না। যুদ্ধ দেখিতে যদি ইচ্ছা থাকে বল, আমি তোমাকে চক্ষু দিতেছি।”

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, “না, আমি চক্ষু চাহি না; পুত্র,

ভ্রাতুষ্পুত্র মারামারি কাটাকাটি করিয়া মরিবে, সে দৃশ্য আমি দেখিতে পারিব না। তবে যদি এমন উপায় করেন যে, আমি সব শুনিতে পাই, তাহা হইলেই যথেষ্ট।"

এ কথায় ব্যাসদেব বলিলেন, "বেশ, এই সঞ্জয়ই তোমাকে যুদ্ধের সকল কথা শুনাইবে। আমার বরে কিছুই ইহার অজ্ঞাত থাকিবে না।" এই বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

ভীষ্মপর্ব্ব

যুদ্ধারম্ভের ঠিক পূর্ব্বে দুই পক্ষ একমত হইয়া এই নিয়ম করিলেন যে, সমানে সমানে যুদ্ধ হইবে; অর্থাৎ রথীতে রথীতে, ঘোড়াতে ঘোড়াতে, হাতীতে হাতীতে আর পদাতিকে পদাতিকে যুদ্ধ হইবে। যাহার হাতে অস্ত্র নাই, কিংবা যে অন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে ব্যস্ত, এরূপ লোককে কেহ আক্রমণ করিবে না।

ইহার পর কৌরব ও পাণ্ডবগণ সৈন্য সাজাইয়া ব্যূহ বাঁধিয়া দাঁড়াইলে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, "আমি কোন্ কোন্ বীরের সহিত যুদ্ধ করিব, তাহা এই সময় স্থির করা আবশ্যক। উভয় দলের মাঝখানে তুমি রথ লইয়া চল।"

রথ ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি মহারথগণের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, অর্জ্জুন দেখিলেন, রাজ্যের জন্য যাঁহাদের বধ করিতে হইবে, তাঁহাদের প্রায় সকলেই আপনার জন। পিতামহ, আচার্য্য মাতুল, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভৃতি গুরুজন ও স্নেহভাজনদিগের প্রতি চাহিয়া তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি গাণ্ডীব ফেলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "হায় হায়! যাঁহাদের জন্য লোকে রাজ্য কামনা করে, সেই সমস্ত আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব বিনাশ করিয়া আমি রাজ্য লইতে যাইতেছি। এমন অন্যায় কাজ আমার দ্বারা হইবে

না। আমি বরং শত্রুহস্তে প্রাণ দিব তথাপি যুদ্ধ করিতে পারিব না।”

সে দিন অর্জ্জুনকে বুঝাইয়া, তিনি যুদ্ধ করিবেন স্বীকার করাইতে কৃষ্ণকে কি কম কষ্ট পাইতে হইয়াছিল! যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণের উপদেশক্রমে অর্জ্জুনের মন উৎসাহে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি গাণ্ডীব লইয়া প্রস্তুত হইলেন। সেই সকল অমূল্য উপদেশ তোমরা বড় হইয়া ‘ভগবদ্গীতা’য় দেখিতে পাইবে।

অর্জ্জুন ত প্রস্তুত হইলেন, এদিকে আবার যুধিষ্ঠিরকে লইয়া বেশ একটু গোলযোগ বাধিল। যুদ্ধ আরম্ভ হয় হয়, এ সময় কোথায় তিনি সকলকে উৎসাহ দিবেন, না, নিজেই রথ হইতে নামিয়া বরাবর কৌরব-ব্যূহের দিকে চলিলেন। কি সর্ব্বনাশ! ভয়ে ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেবের মুখ শুকাইয়া গেল। তাঁহারা ব্যস্ত হইয়া যুধিষ্ঠিরের পিছন পিছন ছুটিলেন, কিন্তু তিনি একটি কথাও বলিলেন না।

এই ব্যাপারে কৌরবপক্ষের লোকেরাও খুব আশ্চর্য্য হইয়া গেল। তাহাদের কেহ কেহ তাঁহাকে কাপুরুষ বলিয়া ধিক্কার দিতেও ত্রুটি করিল না। আবার কেহ কেহ এমন কথাও বলিল যে, ‘যুধিষ্ঠির প্রাণের ভয়ে ভীষ্মের পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিতে যাইতেছেন।’

তখন শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদিগকে সাহস দিয়া বলিলেন, “তোমাদের ভয়ের কোনই কারণ নাই। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে

ধর্ম্মরাজ ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি গুরুজনদিগকে প্রণাম ও তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতে যাইতেছেন। ধর্ম্মই তাঁহাকে রক্ষা করিবেন। তোমরা স্থির হও।”

কৃষ্ণের কথাই ঠিক। যুধিষ্ঠির শত্রুব্যূহে প্রবেশ করিয়া একে একে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও শল্যের চরণবন্দনা করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ভীষ্মের বড়ই আনন্দ হইল। তিনি বলিলেন, “ভাই, তুমি আসিয়াছ, ইহাতে আমি যে কত সুখী হইয়াছি, বলিতে পারি না। আশীর্ব্বাদ করি, তোমাদের জয় হউক।”

যুধিষ্ঠির বলিলেন, “দাদামহাশয়, তাহা কিরূপে সম্ভব হইবে? এমন কে আছে আপনাকে জয় করিতে পারে?”

ভীষ্ম তাঁহাকে সাহস দিয়া বলিলেন, “সেজন্য চিন্তা নাই। তুমি আর একবার আমার সহিত দেখা করিও।”

ইহার পর দ্রোণ ও কৃপ বলিলেন, “কৃষ্ণ সহায় থাকিতে তোমার ভয়ের কোনই কারণ নাই! ধর্ম্ম যখন তোমার পক্ষে, তখন তোমার জয় নিশ্চিত। আমরা সর্ব্বদাই তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিব।”

শল্য বলিলেন, “তোমার প্রার্থনা আমার মনে আছে। অর্জ্জুন ও কর্ণের যুদ্ধের সময়, কর্ণের রথের সারথি হইয়া আমি তাহার তেজ কমাইয়া দিব। এ যুদ্ধে যে তোমার জয় হইবে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।”

ফিরিয়া আসিবার সময় যুধিষ্ঠির চীৎকার করিয়া বলিলেন, “এ পক্ষে আমার হিতাকাঙ্ক্ষী যদি কেহ থাকেন, তবে তিনি

নির্ভয়ে চলিয়া আসুন। আমরা তাঁহাকে আদর করিয়া লইব।”

যুধিষ্ঠিরের কথায় দুর্য্যোধনের ভাই যুযুৎসু বলিলেন, “ধর্ম্মরাজ, আমি আপনার পক্ষ হইয়া কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিব।”

তখন যুধিষ্ঠির তাঁহাকে বুকে টানিয়া লইয়া বলিলেন, “এস ভাই, শ্রীকৃষ্ণের আশীর্ব্বাদে একমাত্র তুমিই শেষে অন্ধ পিতার অবলম্বনস্বরূপ হইয়া থাকিবে।”

যুযুৎসু চলিয়া আসিলে, ভীষ্ম তাঁহার বিশাল শঙ্খে ফু দিয়া যুদ্ধারম্ভ জ্ঞাপন করিলেন। অমনি কৌরবদলে হাজার হাজার শঙ্খ বাজিয়া উঠিল। তাহার উত্তরে কৃষ্ণ, অর্জ্জুন এবং পাণ্ডবদলের অসংখ্য যোদ্ধা আপন আপন শঙ্খের নিনাদে রণস্থলে প্রলয়কাণ্ড উপস্থিত করিলেন।

এইবার মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। গাণ্ডীব ধরিয়া প্রথমেই অর্জ্জুন দুই বাণে ভীষ্মের চরণবন্দনা করিলেন। ভীষ্মও বাণ দ্বারা তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তার পরেই চারিদিকে শুধু দমাদম্ ঝমাঝম্ রণবাদ্য, গুম্‌গাম্ দুম্‌দাম্ অস্ত্রনিনাদ আর লোকের কাতর চীৎকার। ভীম আর দুর্য্যোধনে, শল্য আর যুধিষ্ঠিরে, বিরাট আর ভগদত্তে এবং সাত্যকি আর কৃত-বর্ম্মায় সেদিন রণস্থল কাঁপাইয়া তুলিলেন বটে, কিন্তু ভীষ্ম আর অর্জ্জুনে যে কি ভয়নাক যুদ্ধ হইল, তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। বাণে বাণে সূর্য্য ঢাকিয়া পৃথিবী অন্ধকার হইয়া

গেল। পথ, ঘাট, মাঠ ভরিয়া মৃতদেহের পাহাড় গড়িয়া উঠিল। তথাপি শেষ নাই। সেই ভীষণ যুদ্ধ দেখিয়া দেবতারা পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। কিন্তু উভয়ের এমনই আশ্চর্য্য শিক্ষা যে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা যুদ্ধ করিয়াও কেহ কাহাকে হটাইতে পারিলেন না।

অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যুও সেদিন এমন ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিলেন যে, বড় বড় মহারথগণও তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন।

যুদ্ধের এই প্রথম দিনেই বিরাটপুত্র উত্তর শল্যের হাতে মারা পড়িলেন। কিন্তু উত্তরের দাদা শ্বেত যখন রুখিয়া আসিলেন, তখন শল্য একেবারে কাবু! ভীষ্ম তাড়াতাড়ি ছুটিয়া না আসিলে শল্যের প্রাণরক্ষাই কঠিন হইয়া উঠিত। এমন কি, শ্বেতের বাণে মাঝে মাঝে ভীষ্মকেও নাকালের এক-শেষ হইতে হইল। যাহা হউক, শেষে ভীষ্মের হাতেই তাঁহার মৃত্যু হইল। ইহাতে পাণ্ডবদের দুঃখের অবধি রহিল না। কৃষ্ণ নানাপ্রকারে বুঝাইয়া তাঁহাদিগকে শান্ত করিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিলে সেদিনকার মত যুদ্ধ শেষ হইল।

পরদিন পাণ্ডব সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন 'ক্রৌঞ্চারুণ'-ব্যূহ রচনা করিয়া সৈন্য সাজাইলেন! কৌরবেরা অন্য একপ্রকার ব্যূহ প্রস্তুত করিলে দুই দলে আবার তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

ভীষ্ম ও অর্জ্জুনের আর কি নূতন পরিচয় দিব! তাঁহাদের বাণের শব্দেই যেন ভূমিকম্প হইতে লাগিল; আর বাণের

আগুনে চারিদিকে মাঠ-ঘাট, পাহাড়-পর্ব্বত, গাছ-পালা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে লাগিল।

একদিকে এই মহাযুদ্ধ, আর একদিকে দ্রোণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নে রণস্থল মাতাইয়া তুলিলেন। কিন্তু দ্রোণের তেজ ধৃষ্টদ্যুম্ন কতক্ষণ সহ্য করিবেন? ধৃষ্টদ্যুম্নকে হটিতে দেখিয়া ভীম তাঁহার সাহায্যের জন্য ছুটিয়া আসিলেন আর এমন বিক্রম প্রকাশ করিলেন যে, দ্রোণকেও বিচলিত হইতে হইল।

সেদিনকার যুদ্ধে একা ভীমের হাতে কলিঙ্গ, ভানুমান, কেতুমান প্রভৃতি বড় বড় যোদ্ধারা প্রাণ হারাইলেন। আর তাঁহার গদায় কত হাতী, ঘোড়া, রথ যে বিনষ্ট হইল, কে তাহার হিসাব রাখে!

বালক অভিমন্যুও সেদিন দুর্য্যোধনকে নিতান্ত কম শিক্ষা দেন নাই। বার বার পলাইয়া শেষে দুর্য্যোধন দল বাঁধিয়া আসিয়াছিলেন, তবুও তাঁহাদের দুর্দ্দশার অবধি রহিল না!

ইহার উপর যখন আবার অর্জ্জুন আসিয়া পুত্রের পাশে দাঁড়াইলেন, তখন ব্যাপার অতি গুরুতর হইয়া উঠিল। গাণ্ডীব হইতে উল্কার মত বড় বড় অগ্নিবাণ ছুটিয়া হাজার হাজার রথীকে যমালয়ে পাঠাইল। ভীষ্ম, দ্রোণ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও অর্জ্জুনকে নিরস্ত করিতে পারিলেন না। শেষে এমন হইয়া উঠিল যে, তাঁহাদেরই প্রাণ লইয়া টানাটানি! ভীষ্ম দেখিলেন, এ ভাবে যুদ্ধ চলিলে কৌরবদের রক্ষা করা অসম্ভব হইবে। তাই দ্রোণের সহিত পরামর্শ করিয়া

তাড়াতাড়ি শিঙ্গা বাজাইয়া সেদিনের মত যুদ্ধ বন্ধ করিয়া দিলেন। কৌরব-সৈন্য শিবিরে ফিরিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল!

পরদিন ভীষ্ম 'গরুড়'-ব্যূহ এবং অর্জ্জুন 'অর্দ্ধচন্দ্র'-ব্যূহ করিয়া সৈন্য সাজাইলেন। পূর্ব্বদিন অর্জ্জুন যাহা করিয়াছেন, ভীষ্ম তাহা ভুলেন নাই। ইহার উপর ভীম ও অর্জ্জুনের ভয়ে দুর্য্যোধন রাত্রে তাঁহার নিকট আসিয়া অনেক কান্না-কাটি করিয়াছেন। এই দুই উত্তেজনায় ভীষ্ম আজ এমন তেজের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন যে, অর্জ্জুনেরও মাথা ঘুরিয়া গেল। প্রতি মুহূর্ত্তে ভীষ্মের বাণে শত শত পাণ্ডব-সৈন্য মারা পড়িতেছে, অথচ অর্জ্জুন কোন প্রকারেই তাহা নিবারণ করিতে পারিতেছেন না। কৃষ্ণ কত উৎসাহ দিলেন, কিন্তু আজ যেন অর্জ্জুনের সে তেজই নাই। 'হায়' 'হায়' করিতে করিতে সকলে ছুটাছুটি করিতে লাগিল!

শ্রীকৃষ্ণ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; অন্য উপায় না দেখিয়া নিজের সুদর্শন চক্র লইয়া ভীষ্মকে মারিবার জন্য ছুটিলেন। তাঁহার পায়ের দাপে পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল। ভয়ে কৌরবদের হাতের অস্ত্র মাটিতে পড়িয়া গেল।

ভীষ্মের কিন্তু ভয়ের লেশমাত্র নাই। 'কৃষ্ণের হাতে মরা, এ ত পরম সৌভাগ্যের কথা!' এই ভাবিয়া ভীষ্ম অস্ত্র ফেলিয়া তাঁহার স্তব আরম্ভ করিয়া দিলেন।

এদিকে অর্জ্জুন যখন দেখিলেন, তাঁহারই দোষে কৃষ্ণকে

প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে হইতেছে, তখন লজ্জায় তিনি যেন মরিয়া গেলেন! এতক্ষণে তাহার মোহ কাটিল! হাতে পায়ে ধরিয়া কৃষ্ণকে ফিরাইয়া আনিয়া তিনি অতি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। দেখিতে দেখিতে কৌরবদলে হাহাকার পড়িয়া গেল। সাধারণ সৈন্যের ত কথাই নাই, বড় বড় রথী মহারথের মস্তকেই রণস্থল ভরিয়া উঠিল; ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, শল্য প্রভৃতি সহস্র চেষ্টাতেও অর্জ্জুনকে হটাইতে পারিলেন না। শেষে সৈন্যদল ব্যূহ ভাঙ্গিয়া পলাইতেছে দেখিয়া ভীষ্ম যুদ্ধ থামাইতে বাধ্য হইলেন!

চতুর্থ দিন যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, একা ভীমের প্রতাপ সহ্য করাই কৌরবদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। যেমন, বিশাল তাঁহার হস্ত, তেমনি তাঁহার ভীষণ গদা! তাহার প্রচণ্ড আঘাতে হাজার হাজার হাতী, ঘোড়া, রথ কোথায় যে ঠিক্‌রাইয়া পড়িতে লাগিল, তাহার ঠিকানা নাই: দুর্য্যোধন বার বার হারিয়া তাঁহার চৌদ্দটি ভাইকে পাঠাইয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে ভীম তাহাদের সাতটিকে শেষ করিয়া ফেলিলেন। বাকি সাতটি পলায়ন না করিলে, সেই দিনই তাহাদেরও পৃথিবীর অন্নজল ফুরাইত।

এই ভাবে সমস্ত দিন যুদ্ধ চলিল। বেলা শেষে ভীম ক্লান্ত হইয়া পড়িলে ভগদত্ত প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে একটু বিপাকে ফেলিল; অমনি অসংখ্য রাক্ষস লইয়া মহাবীর ঘটোৎকচ আসিয়া উপস্থিত! তখন ভগদত্তের সব
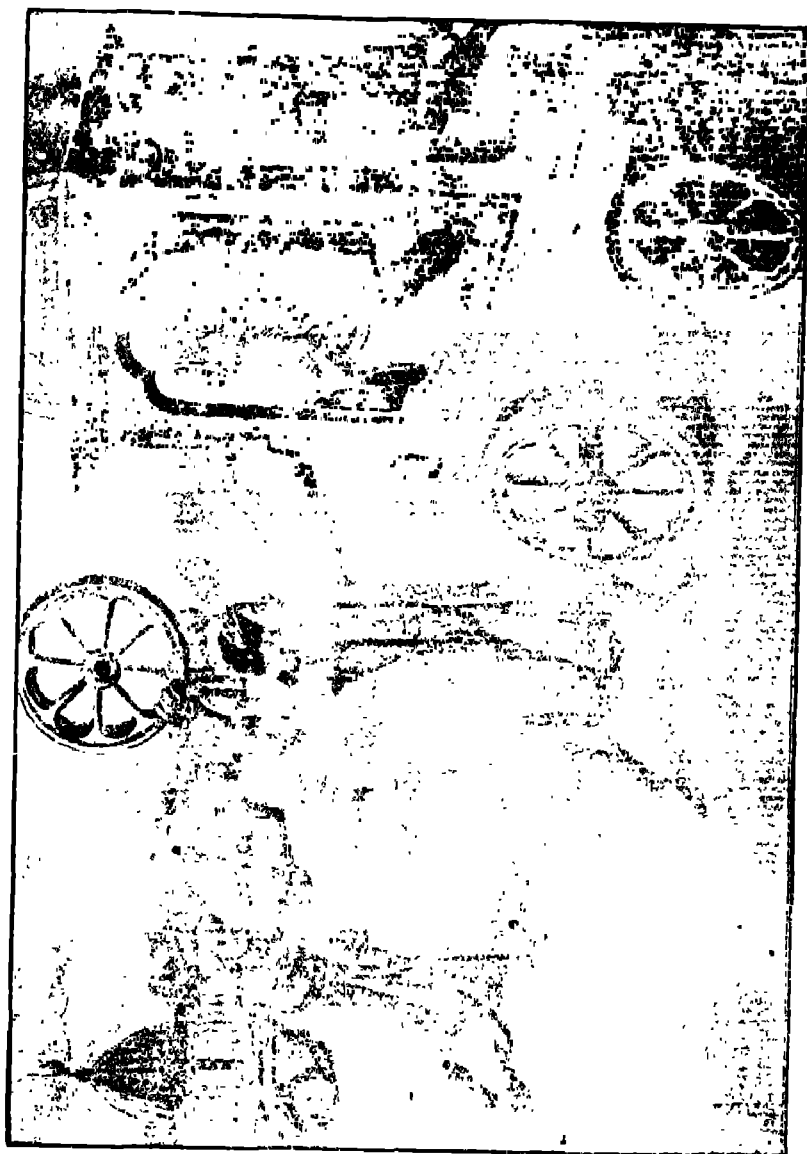
সুদর্শন চক্র লইয়া শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মকে মারিবার জন্য ছুটিলেন।

জারিজুরি ফুরাইল। ভীষ্ম তাড়াতাড়ি যুদ্ধ থামাইয়া না দিলে সেদিন রাক্ষসের হাতেই তাহার প্রাণ যাইত।

পরদিন পাণ্ডবেরা 'শ্যেন'-বূ্যহ এবং কৌরবেরা 'মকর-বূ্যহ রচনা করিয়া সৈন্য সাজাইলেন। তার পর দুই দলে যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, শিখণ্ডী আসিয়া বাণে বাণে ভীষ্মকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু ভীষ্ম যেন তাঁহাকে দেখিয়াও দেখিলেন না। ইহাতে শিখণ্ডীর উৎসাহ আরও বাড়িয়া গেল। হঠাৎ দ্রোণ সেখানে আসিয়া পড়িয়াছিলেন, তাই রক্ষা। নচেৎ ভীষ্মকে হয় ত আরো কত প্রহার সহ্য করিতে হইত! দ্রোণকে দেখিয়া শিখণ্ডী এমন চম্পট্ দিলেন যে, তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়াই ভার!

সেদিন সাত্যকি আর দ্রোণেও ভয়ানক যুদ্ধ হইল। সাত্যকিকে হটিতে দেখিয়া ভীম, অভিমন্যু এবং দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র (প্রতিবিন্ধ্য, সুতসোম, শ্রুতকর্ম্মা, শতানিক আর শ্রুতসেন) আসিয়া তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। ওদিকে ভীষ্ম আর শল্য আসিয়া দ্রোণকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। তখন রণস্থলে তুমুল কাণ্ড বাধিয়া গেল! দুই পক্ষের অসংখ্য সৈন্য প্রাণ হারাইল। একা সাত্যকিই প্রায় দশ হাজার কৌরব সেনা মারিয়া শেষ করিলেন!

কৌরবপক্ষে ভূরিশ্রবাও বড় কম যুদ্ধ করেন নাই। সেই একদিনে তিনি সাত্যকির দশ পুত্রকে যমালয়ে পাঠাইয়াছেন শুনিয়া অর্জ্জুন এমন ক্ষেপিয়া উঠিলেন যে,

পঁচিশ হাজার কৌরব মহারথের প্রাণ না লইয়া ক্ষান্ত হইলেন না।

তার পরদিন পাণ্ডবেরা 'মকর'-ব্যূহ এবং কৌরবেরা 'ক্রৌঞ্চ'-ব্যূহ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। সেদিন ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্নে মিলিয়া কৌরবদের যে দুর্দ্দশা করিলেন, তাহা বর্ণনার অতীত। মানুষের মুণ্ড লইয়া এমন খেলা প্রায়ই দেখা যায় না। দুঃশাসন প্রভৃতি দুর্য্যোধনের তেরটি ভাই এক সঙ্গে রোক্ করিয়া আসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ভীমের গদার শব্দের ভয়ে তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ ঘামিয়া উঠিল। তাহার দুই চারি ঘা মাথায় পড়িলে, না জানি, বেচারাদের কি দশাই হইত! সন্ধ্যা পর্য্যন্ত একই ভাবে যুদ্ধ করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ভীম যখন শিবিরে ফিরিলেন, তখন কৌরবসেনার মৃতদেহ ঠেলিয়া অগ্রসর হওয়াই তাঁহাদের পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছিল।

সপ্তম দিন সকালে পাণ্ডবেরা 'বজ্র' ব্যূহ এবং কৌরবেরা 'মণ্ডপ'-ব্যূহ করিয়া সৈন্য সাজাইলেন। তার পর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, শল্য খুব তেজের সহিত নকুল ও সহদেবকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ যুদ্ধের পরেই সহদেবের এক বাণ খাইয়া তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল। তখন সারথির রথ লইয়া পলায়ন ভিন্ন আর উপায় রহিল না।

আর একদিকে, সেদিন ঘটোৎকচ তেমন সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু সাত্যকির হস্তে রাক্ষস অলম্বুষের দুর্দ্দশার চূড়ান্ত হইল।

অর্জ্জুনের পুত্র ইরাবাণও সেদিন অতি আশ্চর্য্য যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বিন্দু, অনুবিন্দের মত বিখ্যাত যোদ্ধারাও তাঁহার অস্ত্রের তেজ সহ্য করিতে পারে নাই। তাহারা পলায়ন করিলে, ইরাবাণ কৌরবসৈন্য পিষিতে পিষিতে রণস্থলে রক্তস্রোত বহাইয়া দিলেন। ইহাতে কৌরবেরা খুবই ভয় পাইল। যাহা হউক, শেষে বিরাটপুত্র শঙ্খকে মারিয়া দ্রোণ তাহাদের সকলকে উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন। শঙ্খের মৃত্যুতে পাণ্ডবদের দুঃখের সীমা রহিল না!

পরদিন পাণ্ডবেরা 'শৃঙ্গাটক'-ব্যূহ এবং কৌরবেরা সাগরের মত এক প্রকাণ্ড ব্যূহ প্রস্তুত করিলেন। তার পর ভীষ্ম আর ভীমে বিষম যুদ্ধ বাধিয়া গেল। এ কয়দিন এক অর্জ্জুন ছাড়া আর কেহই ভীষ্মের সম্মুখে দাঁড়াইতে সাহস করেন নাই, কিন্তু আজ ভীমের প্রতাপে ভীষ্মকেও একটু দমিতে হইল। দুর্য্যোধনের আটটি ভাই তাঁহার সাহায্যের জন্য আসিলে, ভীম একে একে তাহাদের সবগুলিকে শেষ করিয়া আগুনের মত এক ভয়ানক বাণে ভীষ্মের সারথিকে বিনাশ করিলেন। ভয়ে ঘোড়াগুলি রথ লইয়া চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল!

সেদিন ইরাবাণও খুব তেজের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু শকুনির ছয় ভাইকে মারিবার পরই আর্য্যশৃঙ্গ নামে এক মায়াবী রাক্ষসের হস্তে তিনি নিহত হইলেন। অর্জ্জুন তখন কৌরবসৈন্য মারিতে ব্যস্ত। পুত্রের মৃত্যুর কথা তাঁহার কাণেও পঁহুছিল না।

সেদিনকার যুদ্ধে ভীষ্ম, ভগদত্ত, প্রভৃতি কৌরব এবং দ্রুপদ, ভীম, ঘটোৎকচ প্রভৃতি পাণ্ডব বীরগণ দুই পক্ষের হাজার হাজার সৈন্য মারিয়া শেষ করিলেন। তাঁহাদের উৎসাহ কত!

শেষ বেলায় ভীম আবার ভয়ানক মাতিয়া উঠিলেন। তখন তাঁহাকে নিবারণ করা কৌরবদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, শল্য এবং ভগদত্তের সম্মুখেই তিনি দুর্য্যোধনের আরও নয়টি ভাইকে যমালয়ে পাঠাইলেন। ভীমের কাণ্ড দেখিয়া দুর্য্যোধনের বুক ফাটিয়া গেল।

সেদিন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলেও যুদ্ধ চলিতে লাগিল। গভীর রাত্রে সকলে শিবিরে ফিরিলেন।

দুর্য্যোধনের দুঃখে কর্ণ ও শকুনি খুবই ব্যথা পাইলেন। কর্ণ বলিলেন, "ভীষ্ম মুখে যাহাই বলুন, তাঁহার আর আগের মত তেজ নাই! তিনি অস্ত্রত্যাগ করুন আমি দুই দিনেই ভীম-অর্জ্জুনের যুদ্ধের সাধ মিটাইয়া দিব।"

কর্ণের কথায় দুর্য্যোধন সেই রাত্রে ভীষ্মের নিকট গিয়া বলিলেন, "দাদামহাশয়, ভীমার্জ্জুনের হাতে ত সব শেষ হইতে চলিল। আপনি যদি না পারেন, তবে একবার কর্ণকে বলিয়া দেখুন। তাহার অসাধ্য কিছুই নাই।"

এ কথায় রাগে ও অপমানে ভীষ্ম ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার মুখ দিয়া একটি কথাও সরিল না। শেষে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "দুর্য্যোধন,

আমাকে এ ভাবে অপমান করিতে তোমার লজ্জা হইল না? তোমার জন্য আমি কি না করিতেছি, বল? যে কর্ণের কথায় তুমি আমাকে অপমান করিতে আসিয়াছ, গন্ধর্ব্বযুদ্ধের সময় তাহার বীরত্ব ছিল কোথায়! সে সময় ভীম ও অর্জ্জুন রক্ষা না করিলে তোমার দশা কি হইত, ভাব দেখি! পাণ্ডবেরা কি সাধারণ বীর! যাহা হউক, আর দুঃখ দিও না। কাল আমি এমন যুদ্ধ করিব যে, লোকের চোখে কানে ধাঁধা লাগিয়া যাইবে।”

পরদিন প্রভাত হইতে না হইতে দুই দলে আবার মহা যুদ্ধ বাধিয়া গেল। সেদিন দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র আর অভিমন্যুর বিক্রমে দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা প্রভৃতির ন্যায় বড় বড় যোদ্ধারাও রণস্থল পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহাদের সাহায্যের জন্য রাক্ষস অলম্বুষ আসিয়া মায়া-যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু অভিমন্যুর বাণের কাছে তাহার কোন চালাকিই খাটিল না!

সেদিন ভীম এবং সাত্যকিও বিশ্রামের অবসর পান নাই, কিন্তু অর্জ্জুন যাহা করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা হয় না। তাঁহার অস্ত্র ঠিক যেন বেড়াপাকের ন্যায় চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল আর হাজার হাজার কৌরবসেনা সেই বিষম পাকে পড়িয়া প্রাণ হারাইল!

এতক্ষণ ভীষ্ম সহজ ভাবেই যুদ্ধ করিতেছিলেন! কিন্তু শেষ বেলায় তিনি একেবারে আগুন হইয়া উঠিলেন এবং রণ-

স্থল ঠিক অগ্নিকুণ্ডে পরিণত করিলেন! তখন অর্জ্জুনেরও এমন সাধ্য হইল না যে, তাঁহাকে নিবারণ করেন। পাণ্ডব-সৈন্য ভয়ে চীৎকার করিতে করিতে অস্ত্র ফেলিয়া ব্যূহ ভাঙ্গিয়া পলাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু ভীষ্মের অস্ত্র এড়াইয়া একটি প্রাণীও রক্ষা পাইল না।

ব্যাপার দেখিয়া কৃষ্ণও বিচলিত হইলেন। নিজের প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া আবার তিনি ভীষ্মকে সংহার করিবার জন্য ছুটিলেন। অর্জ্জুন এবারও অনেক কষ্টে তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিলেন বটে, কিন্তু কোন মতেই ভীষ্মের প্রহার হইতে নিজের সৈন্যগণকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এই ভাবে যুদ্ধ চলিল। সন্ধ্যার পর 'হায়' 'হায়' করিতে করিতে পাণ্ডবেরা শিবিরে ফিরিলেন।

সে রাত্রে কাহারও ঘুম হইল না। বৃদ্ধ ভীষ্মকে পুনরায় যুবকের ন্যায় উৎসাহে যুদ্ধ করিতে দেখিয়া সকলেই ভয় পাইলেন। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বলিলেন, "নিজে ইচ্ছা করিয়া না মরিলে যাঁহার মৃত্যু নাই, এমন বীরকে জয় করা ত অসম্ভব! এখন উপায়!" কৃষ্ণ বলিলেন, "ভীষ্ম আপনাকে আর একবার তাঁহার নিকট যাইতে বলিয়াছিলেন। চলুন, এই রাত্রেই তাঁহার সহিত দেখা করিয়া কিঞ্চিৎ উপদেশ লইয়া আসি।

কৃষ্ণের কথায় সকলেরই খুব উৎসাহ হইল। ইহারা পঞ্চপাণ্ডব ও কৃষ্ণ যখন ভীষ্মের শিবিরে উপস্থিত হইয়া

তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, তখন বৃদ্ধের আনন্দের আর সীমা রহিল না। তিনি বলিলেন, "এতক্ষণ তোমাদের কথাই ভাবিতেছিলাম। তোমরা আসিয়া ভালই করিয়াছ। এই কয়দিনের যুদ্ধে অসংখ্য প্রাণিহত্যা করিয়া আমার মনে অত্যন্ত ক্লেশ হইতেছে। আর একদণ্ডও আমার বাঁচিতে ইচ্ছা নাই। তোমরা যদি কালই আমাকে মারিতে পার, আমি খুব সুখী হইব।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "আপনাকে বধ করিতে পারে, এমন বীর ত দেখি না।"

ভীষ্ম বলিলেন, "সে কথা ঠিক। আমি ইচ্ছা করিয়া অস্ত্র ত্যাগ না করিলে কাহারও শক্তি নাই যে, আমাকে হারাইতে পারে। আমাকে অস্ত্র-ত্যাগ করাইবার একটা অতি সহজ উপায় বলিয়া দিতেছি। তোমাদের দলে যে শিখণ্ডী আছে, তাহাকে দেখিলেই আমি অস্ত্র-ত্যাগ করিব; কেন না, সে স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোকের অঙ্গে ত আর প্রহার করিতে পারি না! অর্জ্জুন যদি তাহাকে সম্মুখে রাখিয়া আমার সহিত যুদ্ধ করে, তবে অক্লেশেই আমাকে মারিতে পারিবে।

এই শিখণ্ডীর কথা শুনিলে তোমরা আশ্চর্য্য হইবে। আমার ভাই বিচিত্রবীর্য্যের সহিত বিবাহ দিবার জন্য আমি স্বয়ংবর-সভা হইতে কাশীরাজের তিনটি কন্যা হরণ করিয়া লইয়া আসিয়াছিলাম। তাহাদের মধ্যে 'অম্বা' নামে কন্যাটি

মনে মনে শাল্বরাজকে ভালবাসিত। এই কথা জানিতে পারিয়া আমি তাহাকে শাল্বের নিকট পাঠাইয়া দিই। কিন্তু কি জন্য জানি না, শাল্ব তাহাকে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। শেষে আমার নিকট আসিলে, আমিও তাহাকে আশ্রয় দিই নাই। সেই অপমানে অম্বা তপস্যা করিয়া শিবকে সন্তুষ্ট করে এবং তাঁহারই বরে আমাকে মারিবার জন্য এ জন্মে শিখণ্ডী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

তোমাদিগকে এ কথা বলিবার জন্য আমি ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। শিব অনেক দিন আগেই আমার মৃত্যুর উপায় করিয়া রাখিয়াছেন। তোমরা উপলক্ষ্য মাত্র। আমি অনুমতি দিতেছি, শিখণ্ডীকে লইয়া কালই আমাকে বধ কর। ইহাতে আমিও শান্তি পাইব, তোমাদেরও মঙ্গল হইবে।”

ভীষ্মের উপদেশ শুনিয়া অর্জ্জুনের বীর হৃদয় টলিয়া গেল। শিবিরে ফিরিয়া তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে কৃষ্ণকে বলিলেন, “হায় হায়, কি সর্ব্বনাশ! ছেলেবেলা যাঁহার কোলে পিঠে চড়িয়া মানুষ হইয়াছি, পিতৃহীন অবস্থায় যিনি পিতার অধিক স্নেহে আমাদিগকে পালন করিয়াছেন, আজ কি না রাজ্যের জন্য তাঁহাকে বধ করিতে হইবে! আমি কোন মতেই তাহা পারিব না।”

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, “ইহাতে তোমার কোন হাত নাই। শিব যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার কি অন্যথা হইতে পারে?

আর ভীষ্মের অবস্থা ত দেখিলে? মৃত্যু ভিন্ন যখন তাঁহার শান্তি নাই, তখন বৃথা শোকে অভিভূত হইয়া তাঁহার যন্ত্রণা-বৃদ্ধি করা কখনই উচিত নহে।

কৃষ্ণের কথা অর্জ্জুন অনেকক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করিলেন। শেষে বলিলেন, "ভাল! এই কালযুদ্ধের জন্য যখন সবই করিতে হইতেছে, তখন দাদামহাশয়কেও বধ করিব।"

পরদিন রণস্থলে অতি ভয়ানক কাণ্ড আরম্ভ হইল। শিখণ্ডীকে সঙ্গে লইয়া আজ পাণ্ডবেরা যেমন মাতিয়া উঠিয়াছেন, ভীষ্মও তেমনি সিংহবিক্রমে যুদ্ধ করিতেছেন। আজ তাঁহার বাণে পৃথিবী ফাটিয়া আগুন বাহির হইতে লাগিল, আকাশ ভরিয়া বিদ্যুৎ খেলিতে লাগিল, বজ্রের মহাশব্দে দশ দিক্ কাঁপিতে লাগিল। এতদিন তিনি কেবল মানুষের মাথা উড়াইয়াছেন, আজ পাহাড়-পর্ব্বত কিছুই আর বাকি রাখিলেন না।

এদিকে যুদ্ধে আসিয়া অবধি শিখণ্ডী শুধু ভীষ্মকে লইয়াই ব্যস্ত। বাণে বাণে বৃদ্ধের সর্ব্বাঙ্গে রক্তধারা বহিতেছে। তিনি যতই অগ্রাহ্য করিতেছেন শিখণ্ডীর বাণের তেজ ততই প্রখর হইয়া উঠিতেছে।

এ সময় দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতি কৌরব-রথীরা কোথায়? ভীষ্মই যেন শিখণ্ডীকে মারিবেন না, তাঁহারা আসিয়া ত শিখণ্ডীর প্রহার হইতে ভীষ্মকে বাঁচাইতে পারেন! কিন্তু হায়, সে পথও বন্ধ! ভীম, অর্জ্জুন এমন করিয়া তাঁহাদের

সকলকে আট্‌কাইয়া ফেলিয়াছেন যে, এক পাও নড়িবার উপায় নাই!

উঃ, অর্জ্জুনের আজ কি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি! গাণ্ডীব হইতে আজ যেন শুধু অগ্নি-বৃষ্টি হইতেছে। সেই আগুনে কৌরব-দল জ্বলিয়া পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাইতেছে। কাহারও সাধ্য নাই, তাঁহাকে নিবারণ করে।

অর্জ্জুনের কাণ্ড দেখিয়া দুর্য্যোধনের মাথা ঘুরিয়া গেল! তিনি হাঁপাইতে হাঁপাইতে ভীষ্মের কাছে গিয়া বলিলেন, "দাদামহাশয়, আপনি একটু মন দিয়া যুদ্ধ করুন। অর্জ্জুন একদিক্ হইতে সমস্ত শেষ করিয়া দিল!"

তাঁহার কথায় ভীষ্মের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন, 'কি অকৃতজ্ঞ! এই বয়সে ক্রমাগত দশ দিন ধরিয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছি, প্রত্যহ পাণ্ডবপক্ষের অন্যূন দশ হাজার করিয়া সৈন্য মারিয়াছি, তথাপি দুর্য্যোধন অসন্তুষ্ট! আজ প্রাণ দিয়া উহার অন্নের ঋণ পরিশোধ করিব।' এই ভাবিয়া ভীষ্ম তাঁহার জীবনের শেষ যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন!

সে যে কি ভীষণ যুদ্ধ, মনে করিতেও বুক কাঁপিয়া উঠে! যে ভাবে যুদ্ধ করিলে এবং শত্রু সংহার করিতে করিতে যে ভাবে প্রাণ দিলে, ক্ষত্রিয় স্বর্গে যায়, ভীষ্ম ঠিক সেই ভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কি আশ্চর্য্য তাঁহার শক্তি! আর কি ভয়ানক তাঁহার অস্ত্র! সেই এক দিনেই পাণ্ডবদের শত

ভীষ্মের শরশয্যা :—১৪১ পৃষ্ঠা।
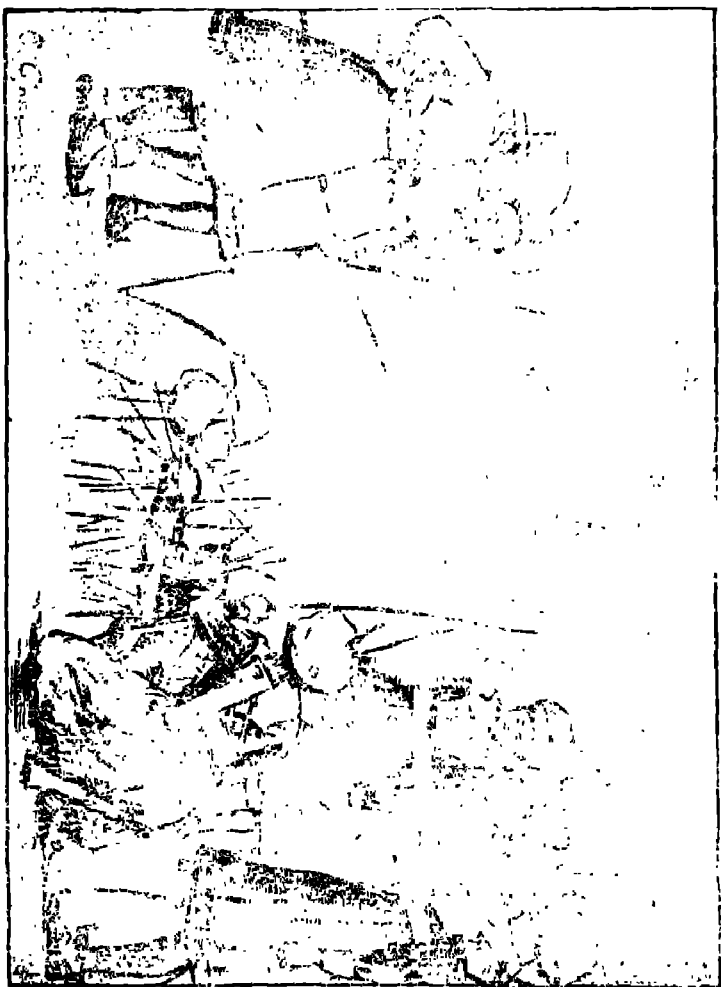
শত রথী, পাঁচ হাজার হাতী, দশ হাজার ঘোড়া এবং চৌদ্দ হাজার পদাতি তিনি সংহার করিলেন।

এদিকে শিখণ্ডীর এক মুহূর্ত্তও বিশ্রাম নাই। বেলা যতই শেষ হইতে লাগিল, তিনিও ততই আরও প্রবলভাবে ভীষ্মকে আঘাত করিতে লাগিলেন! কিন্তু ভীষ্ম তাঁহার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিলেন না।

এই সময় হঠাৎ যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় ভীষ্ম বলিলেন, "ভাই, আর কেন আমাকে কষ্ট দিতেছ? অর্জ্জুনকে লইয়া শীঘ্র আমাকে বধ কর, আমি শান্তি পাই।"

ভীষ্মের কথায় যুধিষ্ঠিরের বুক ফাটিয়া গেল। তাঁহার দুই চক্ষে ধারা বহিতে লাগিল।

ইহার পর হইতে যুদ্ধ আরও ঘোরতর হইয়া উঠিল। শিখণ্ডীকে সম্মুখে রাখিয়া অর্জ্জুন ভীষ্ম বধে মনোযোগ দিলেন। তাঁহাকে বাধা দিবার জন্য কৌরবেরা চেষ্টার ত্রুটি করিল না। দ্রোণ, কৃপ, শল্য, দুঃশাসন সকলেই প্রাণপণে লাগিলেন; কিন্তু সাধ্য কি যে, অর্জ্জুনকে নিবৃত্ত করেন! এদিকে সাত্যকি, ভীম, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি অর্জ্জুনের রক্ষার জন্য ছুটিয়া আসিলেন, কিন্তু তিনি কাহারও সাহায্যের অপেক্ষা রাখিলেন না। একাই ভীষ্মের অঙ্গে কঠিন প্রহার এবং কৌরব-রথীদের সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। শেষে তাঁহার বাণের তেজ এমনই বাড়িয়া গেল যে, ভীষ্ম ভিন্ন আর কেহই সেখানে দাঁড়াইতে সাহস করিলেন না।

ভীষ্মই বা আর কত সহ্য করিবেন! শিখণ্ডী সমস্ত দিন ধরিয়া তাঁহাকে কঠিন আঘাত করিয়াছেন, তথাপি তিনি বিচলিত হন নাই, কিন্তু অর্জ্জুনের বাণ কি সে ভাবে অগ্রাহ্য করিবার উপায় আছে? সে বাণ যতই তাঁহার মর্ম্মে গিয়া বিঁধিল, ততই তিনি অবশ হইয়া পড়িতে লাগিলেন, চক্ষে ততই ধোঁয়া দেখিতে লাগিলেন।

অর্জ্জুন পূর্ব্বেই ভীষ্মের ধনুক কাটিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি একটা শক্তি ছুড়িয়াছিলেন; অর্জ্জুন তাহাও কাটিয়াছেন। শেষে খড়্গ লইলে অর্জ্জুন তাহাও খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন!

ভীষ্মের শরীরে আর তিল পরিমাণ স্থানও অক্ষত ছিল না। বাণে বাণে জর্জ্জরিত হইয়া সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে তিনি রথ হইতে পড়িয়া গেলেন। অমনি চারিদিকে কি কাতর আর্ত্তনাদ! সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যেন টল্‌মল্‌ করিতে লাগিল। মর্ত্ত্যের ক্ষুদ্র মানব আর স্বর্গের দেবতাগণ একসঙ্গে একই শোকে 'হায়' 'হায়' করিতে লাগিলেন।

ভীষ্মের সর্ব্বাঙ্গে এত বাণ ফুটিয়াছিল যে, রথ হইতে পড়িলেও তাঁহার পবিত্র দেহ ভূমি স্পর্শ করিল না! শর-শয্যায় তিনি শূন্যেই রহিয়া গেলেন।

ভীষ্মের পতন-সংবাদ বিদ্যুদ্বেগে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। সৈন্যগণ অস্ত্র ফেলিয়া কবচ খুলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া আসিল। আজ আর শত্রু-মিত্রে প্রভেদ নাই। আজ কৌরবেরা কাঁদিল ভীষ্মকে হারাইয়া, পাণ্ডবেরা

কাঁদিল ভীষ্মকে বধ করিয়া। শোকের অশ্রুজলে আজ রণভূমি প্লাবিত হইতে লাগিল।

ভীষ্ম সকলকে অভিবাদন করিয়া শেষে বলিলেন, "দেখ, অর্জ্জুন আমাকে কেমন সুন্দর বিছানা দিয়াছে! সূর্য্য যতদিন আকাশের দক্ষিণ দিকে থাকিবেন, ততদিন এই শরশয্যায় আমি বিশ্রাম করিব! সূর্য্য যখন আকাশের উত্তর ভাগে যাইবেন, তখনই আমার মৃত্যুর উপযুক্ত সময়। তোমরা কেহ আমার জন্য শোক করিও না!" এই বলিয়া তিনি কিছুক্ষণ নীরব হইলেন। তার পর আবার ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমার মাথা ঝুলিয়া পড়িয়াছে, বালিশ আনিয়া দাও।"

ভীষ্মের কথায় দুর্য্যোধন তখনই সুন্দর সুন্দর রেশমী বালিশ আনাইলেন; দেখিয়া ভীষ্ম বলিলেন, "আমার বিছানার যোগ্য বালিশ চাই! অর্জ্জুন তুমি থাকিতে আমার বালিশের অভাব?

অর্জ্জুনের বুক ফাটিয়া যাইতেছিল। ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া তিনি ভীষ্মের পদধূলি লইলেন। তার পর তিন বাণে তাঁহার শয্যার উপযুক্ত বালিশ তৈয়ার করিয়া দিলেন!

ইহাতে ভীষ্মের যে কি আনন্দ হইল, তাহা বলিয়া বুঝান যায় না। তিনি অর্জ্জুনকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "ভাই, ধন্য তোমার অস্ত্রশিক্ষা! তোমার মত বীর ত্রিভুবনে নাই।

ইহার পর ভীষ্মের চারিদিকে পরিখা খনন করাইয়া এবং

সেখানে উপযুক্ত পাহারা রাখিয়া কৌরব ও পাণ্ডব-দল গভীর রাত্রে শিবিরে ফিরিলেন।

পরদিন আবার সকলে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ, যুবা-প্রবীণ—কাহারও আসিতে বাকি ছিল না। সকলেরই চক্ষু অশ্রুসিক্ত! তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ভীষ্ম বলিলেন, "আমাকে জল দাও।"

এ কথায় দুর্য্যোধন নিজের সুশীতল জল লইয়া আসিলেন। তাহা দেখিয়া ভীষ্ম হাসিয়া বলিলেন, "এ জলে এখন আর আমার তৃপ্তি হইবে না। ভাই অর্জ্জুন, তুমিই আমার জলের বন্দোবস্ত কর।"

ভীষ্মের মনের ভাব বুঝিতে অর্জ্জুনের বিলম্ব হইল না। তিনি বরুণ অস্ত্র লইয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিবামাত্র তাহা হইতে নির্ম্মল জলধারা উঠিয়া ভীষ্মের মুখে পড়িতে লাগিল। জলের মিষ্টতায় ও সুগন্ধে তাঁহার সকল অবসাদ দূর হইল। তিনি উৎসাহে অর্জ্জুনকে স্নেহালিঙ্গনে কৃতার্থ করিলেন।

তার পর ভীষ্ম দুর্য্যোধনকে কাছে ডাকিয়া যুদ্ধে ক্ষান্ত হইবার জন্য অনেক উপদেশ দিলেন, কিন্তু তাঁহার কথায় কোনই ফল হইল না।

সকলে চলিয়া গেলে কর্ণ কাঁদিতে কাঁদিতে ভীষ্মের নিকট আসিয়া নিজের পরিচয় দিলেন। ভীষ্ম তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "রাধা তোমার মাতা নহে; আমি ঋষিদের মুখে শুনিয়াছি, তুমি কুন্তীর পুত্র। কুসঙ্গে যোগ দিয়া তুমি

সর্ব্বদাই পাণ্ডবদের নিন্দা করিতে, তাই আমি তোমাকে কঠোর কথা বলিতাম। কিন্তু আমি যখন যাহা বলিয়াছি, সবই তোমার মঙ্গলের জন্য। যাহা হউক, এখন ত নিজের ভাইদের জানিলে? তাহাদের সহিত মিলিয়া সকল গোলযোগ মিটাইয়া ফেল; দেখিয়া, জীবনের শেষ দিনগুলি আমি সুখে কাটাইয়া যাই।”

কিন্তু কর্ণও যুদ্ধ থামাইতে রাজী হইলেন না। ভীষ্ম আর কি করিবেন? কৌরবদের পরাজয় নিশ্চিত জানিয়া ব্যথিত অন্তরে মৃত্যুর জন্য সূর্য্যের উত্তরায়ণের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

দ্রোণপর্ব্ব

ভীষ্ম আহত হইলে কর্ণের পরামর্শে দুর্য্যোধন আচার্য্য দ্রোণকে কৌরবদলের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করিলেন। ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া দ্রোণ বলিলেন, "ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করা ছাড়া আর যে কোন কাজ বলিবে, আমি তাহাই করিয়া দিব।

দুর্য্যোধন বলিলেন, "আর কিছু চাহি না, আপনি যুধিষ্ঠিরকে ধরিয়া দিন।"

দ্রোণ বলিলেন, "অর্জ্জুনকে যদি কৌশলে দূরে রাখিতে পার, তবে আমি নিশ্চিতই তাঁহাকে ধরিয়া দিব।"

চরের মুখে এ কথা শুনিয়া যুধিষ্ঠির বিশেষ ভয় পাইলেন; কিন্তু অর্জ্জুন তাঁহাকে সাহস দিয়া বলিলেন, "আমি বাঁচিয়া থাকিতে আপনার কোনই চিন্তা নাই। আচার্য্য ত দূরের কথা, দেবতারাও চেষ্টা করিলে আপনাকে ধরিতে পারিবেন না।"

পরদিন সকালে দ্রোণ এক আশ্চর্য্য ব্যূহ রচনা করিলেন। উহার দক্ষিণে ও বামে কৃপ, কৃতবর্ম্মা, দুঃশাসন প্রভৃতি বীরগণ এবং সম্মুখে মহাবীর কর্ণ। ভীষ্মের পতনের পর কর্ণ এই প্রথম অস্ত্রধারণ করিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়াই অর্জ্জুনের চক্ষু দিয়া আগুন ছুটিতে লাগিল।

ইহার পর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, দ্রোণ ঠিক ঘুর্ণিবায়ুর মত প্রবল বেগে পাণ্ডবদের উপর গিয়া পড়িলেন! তাঁহার

দেহের বল আজ যেন শতগুণ বাড়িয়া গিয়াছে! তাঁহার ধনুক হইতে একসঙ্গে হাজার বাণ হাজার দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে! আজ কি আর কাহারও রক্ষা আছে!

দ্রোণের কাণ্ড দেখিয়া দ্রুপদ, সাত্যকি, যুধিষ্ঠির, ভীম ও অভিমন্যু ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। আর ওদিকে কৃপ, কর্ণ, শল্য, অশ্বত্থামা ও হার্দ্দিক্য আসিয়া দ্রোণের সহিত যোগ দিলেন।

তখন দুই দলে ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়া গেল। এই যুদ্ধে ভীম ও অভিমন্যু না করিলেন, এমন কাজ নাই! শল্য আর হার্দ্দিক্য কোমর বাঁধিয়া রুখিয়া দাঁড়াইলে, অভিমন্যু হার্দ্দিক্যের চুলের ঝুঁটি ধরিয়া এমন আছাড় দিলেন যে, তাহাতেই তাঁহার অর্দ্ধেক প্রাণ বাহির হইয়া গেল। আর শল্য ত ভীমের গদার এক আঘাতেই বাহ্যজ্ঞানশূন্য!

চক্ষের সম্মুখে এই ব্যাপার দেখিয়া দ্রোণের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। বার বার সকলকে সাহস দিয়া তিনি যুধিষ্ঠিরের রথ লক্ষ্য করিয়া ছুটিলেন। পথে বিরাট, দ্রুপদ, সাত্যকি, নকুল, সহদেব ও শিখণ্ডী তাঁহাকে আট্‌কাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইলেন না।

শেষে আচার্য্যকে যুধিষ্ঠিরের অতি নিকটে যাইতে দেখিয়া পাণ্ডবসেনা ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল, 'হায় হায়! ধর্ম্মরাজ বুঝি ধরা পড়িলেন!' কৌরবদের তখন কি উল্লাস!

এমন সময় হঠাৎ অর্জ্জুনের গাণ্ডীবের ভীষণ টঙ্কার আর

অস্ত্রের বজ্রধ্বনি রণস্থল কাঁপাইয়া তুলিল। আর কি কেহ সেখানে দাঁড়াইতে সাহস করে! দেখিতে দেখিতে যুদ্ধের হাওয়া ফিরিয়া গেল। যুধিষ্ঠির ত রক্ষা পাইলেনই, শুধু তাই নয়, অর্জ্জুন কৌরবদল ছারখার করিয়া শেষে দ্রোণকে এমন শিক্ষা দিলেন যে, সেদিন আর তাঁহার ভাল করিয়া যুদ্ধই করা হইল না।

ক্রমে সন্ধ্যা হইলে, সেদিনকার মত যুদ্ধ থামিয়া গেল। যুধিষ্ঠিরকে ধরিতে না পারিয়া আচার্য্য বিষণ্ণ মুখে শিবিরে ফিরিলেন।

সেকালে এক শ্রেণীর সৈন্য ছিল, তাহারা অগ্নি সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিত যে, শত্রু যতই প্রবল হউক, তাহাকে না মারিয়া ফিরিবে না। তাহাদিগকে 'সংশপ্তক' বলিত। দুর্যোধনের দলে এই সংশপ্তক সৈন্যের অভাব ছিল না!

দ্রোণকে বিষণ্ণ দেখিয়া সুশর্ম্মা বলিলেন, "সংশপ্তকদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য কাল আমরা অর্জ্জুনকে দূরে লইয়া যাইব। সেই সুযোগে আপনি যুধিষ্ঠিরকে ধরিয়া ফেলিবেন।

এইরূপে যুক্তি করিয়া সকলে প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। পরদিন যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, সংশপ্তকগণ অর্জ্জুনকে যুদ্ধে আহ্বান করিল। এরূপ স্থলে কোন বীরপুরুষই 'না' বলিতে পারেন না। কাজেই অর্জ্জুনকে যাইতে হইল। কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে তিনি যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, "আপনার রক্ষার জন্য আমি

সত্যজিৎকে রাখিয়া যাইতেছি। যদি বেগতিক দেখেন, তৎক্ষণাৎ রণস্থল পরিত্যাগ করিবেন।"

এই বলিয়া অর্জ্জুন সক্রোধে ছুটিয়া চলিলেন। তার পর কি যুদ্ধই বাধিল! সংশপ্তকদের কঠিন প্রতিজ্ঞা, আজ অর্জ্জুনকে না মারিয়া ফিরিবে না সুতরাং তাহারা কিরূপ যুদ্ধ করিল, বুঝিতে পার। কিন্তু অর্জ্জুনকে পরাস্ত করে কাহার সাধ্য! বরং তাঁহারই হস্তে দলে দলে সংশপ্তক শেষ হইতে লাগিল। তবু কি সে দল ফুরায়; এক দল মরিলে আরও পাঁচ দল আসে। তাহারা মরিলে আরও দশ দল আসিয়া যুদ্ধ করে। ইহার মধ্যে আবার দুর্য্যোধন নারায়ণী সেনা পাঠাইয়া দিয়াছেন। সংশপ্তকদিগের সহিত যোগ দিয়া তাহারাও অর্জ্জুনকে ব্যস্ত করিয়া তুলিল!

দ্রোণ এতক্ষণ যে মহাসুযোগ খুঁজিতেছিলেন, অবশেষে তাহাই উপস্থিত। অর্জ্জুন কাছে নাই, যুধিষ্ঠিরকে কে রক্ষা করিবে? আচার্য্য একে একে সত্যজিৎ, দৃঢ়সেন প্রভৃতি বড় বড় পাণ্ডব-রথী বধ করিয়া যুধিষ্ঠিরের দিকে রথ ছুটাইয়া দিলেন। কিন্তু এবার যুধিষ্ঠির পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন। দ্রোণের রথ দেখিয়াই তিনি রণস্থল পরিত্যাগ করিলেন; সুতরাং এইবারও দ্রোণকে লজ্জা পাইতে হইল।

সেদিন ভীম আর দুর্য্যোধনেও বিষম যুদ্ধ হইয়াছিল। দুর্য্যোধন পলাইলে ঐরাবতের মত হাতীতে চড়িয়া ভগদত্ত আসিল! ভীম ইহার পূর্ব্বে হাজার হাজার হাতী মারিয়াছেন,

কিন্তু ভগদত্তের হাতীর কাছে তাঁহাকে বড়ই নাকাল হইতে হইল। সেই সর্বনেশে হাতী যে শুধু ভীমকেই জব্দ করিল, তাহা নহে; পাণ্ডবদের হাতী, ঘোড়া, রথ পায়ের তলে পিষিয়া লণ্ডভণ্ড করিয়া ফেলিল! তখন চারিদিকেই শুধু 'হায়' 'হায়' হাহাকার!

অর্জ্জুন তখনও সংশপ্তক মারিতে ব্যস্ত। পাণ্ডবসৈন্যের কাতর চীৎকার শুনিয়া তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। যুধিষ্ঠিরের বিপদ্ ভাবিয়া তিনি কৃষ্ণকে রথ ফিরাইতে বলিলেন। কিন্তু ঠিক সেই সময় আর একদল সংশপ্তক আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। যাহা হউক, তাহাদিগকে শেষ করিতে অর্জ্জুনের অধিক বিলম্ব হইল না।

অর্জ্জুন ফিরিয়া আসিয়া ভগদত্তের কাণ্ড দেখিয়া রাগে আগুন হইয়া উঠিলেন এবং বাণে বাণে তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। বীরত্বে ভগদত্তও কম ছিল না। বিশেষতঃ তাহার কাছে যে এক মহা অস্ত্র ছিল, স্বয়ং ইন্দ্রও তাহার তেজ সহ্য করিতে অক্ষম! অর্জ্জুনের প্রহারে অস্থির হইয়া ভগদত্ত সেই ভয়ঙ্কর অস্ত্র ছুড়িয়া মারিল!

তখন কৃষ্ণ আর কি করেন, তাড়াতাড়ি আপনার বুক পাতিয়া দিলেন। কৃষ্ণের বুকে পড়িয়া সে অস্ত্র ধোঁয়ার ন্যায় কোথায় মিলাইয়া গেল। অর্জ্জুন সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন।

এই অস্ত্রের প্রভাবেই এতক্ষণ ভগদত্তকে কেহ হারাইতে পারে নাই। অস্ত্রহীন হওয়াতে সে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া

পড়িল; তখন তাহাকে মারিতে অর্জ্জুনের বিশেষ কষ্ট পাইতে হইল না। তাহার হাতীটাকে/ অর্জ্জুন অনায়াসেই শেষ করিয়া ফেলিলেন!

কৌরবপক্ষের আর যাহারা বড়ই আস্ফালন করিতেছিল, অর্জ্জুন তাহাদিগকে উচিত শিক্ষা দিলেন।

সেদিন শেষ বেলায় যুদ্ধ আবার অতি ভয়ানক হইয়া উঠিল। দ্রোণের হাতে পাণ্ডব সেনার নিগ্রহ দেখিয়া ভীম, অর্জ্জুন ও সাত্যকি ছুটীয়া আসিলেন ওদিকে অশ্বত্থামা ও কর্ণ আসিয়া দ্রোণের সহিত যোগ দিলেন। এই মহাযুদ্ধে অর্জ্জুন এক এক করিয়া কর্ণের তিন ভাইকে যমালয়ে পাঠাইলেন। আর দ্রোণ সাহায্য না করিলে, সাত্যকির বাণে কর্ণকেও বোধ হয় ভাইদের সহযাত্রী হইতে হইত।

পরদিন দ্রোণ 'চক্রব্যূহ' করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন! এদিকে সংশপ্তকেরা আসিয়া পুনর্ব্বার অর্জ্জুনকে ডাকিয়া লইয়া গেল।

পাণ্ডবেরা দেখিলেন, কৌশলে ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিলে আর রক্ষা নাই! দ্রোণ যেরূপ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, তাহাতে সেই দিনই বুঝি বা সর্ব্বনাশ হয়।

যুধিষ্ঠিরের অঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। নিতান্ত নিরুপায় হইয়া তিনি অভিমন্যুকে ডাকিয়া বলিলেন, "বৎস, আমি, শুনিয়াছি, অর্জ্জুন তোমাকে এই ব্যূহে প্রবেশ করিবার কৌশল

শিখাইয়াছে। এখন যাহাতে দ্রোণের চেষ্টা ব্যর্থ হয়, তাহার উপায় কর।”

অভিমন্যু বলিলেন, “আমি ইহাতে প্রবেশ করিবার কৌশল শিখিয়াছি বটে, কিন্তু বাহির হইবার কৌশল জানি না।”

তখন যুধিষ্ঠির ভীম, সাত্যকি, দ্রুপদ, ধৃষ্টদ্যুম্ন সকলে একবাক্যে বলিলেন, “তুমি পথ দেখাইয়া দাও, আমরা তোমার পিছন পিছন গিয়া কৌরবদের দর্প চূর্ণ করিব।”

এ কথায় সাহস পাইয়া অভিমন্যু সেই চক্রব্যূহ লক্ষ্য করিয়া রথ চালাইলেন। জয়দ্রথ দ্বার রক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহাকে এড়াইয়া ব্যূহে প্রবেশ করিতে অভিমন্যুর কিছু মাত্র ক্লেশ পাইতে হইল না। কিন্তু যাঁহারা তাহার সাহায্যের জন্য গিয়াছিলেন, মহাদেবের বরে জয়দ্রথ তাঁদের সকলকেই পরাস্ত করিলেন।

তখন অভিমন্যুর বিপদের কথা ভাবিয়া যুধিষ্ঠির, ভীম, সাত্যকি, দ্রুপদ প্রভৃতি বাহিরে দাঁড়াইয়া ‘হায় হায়’ করা ছাড়া আর উপায় রহিল না।

অভিমন্যুর কিন্তু ভ্রূক্ষেপমাত্র নাই। ব্যূহে প্রবেশ করিয়া তিনি অতি আশ্চর্য্য তেজ প্রকাশ করিলেন। তাঁহার বিক্রমে কৌরবদের হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হইল। তাহারা পলাইতে ব্যস্ত, যুদ্ধ করিবে কে? বার বার পরাজিত হইয়া দ্রোণ বলিলেন, “এত বড় যোদ্ধা আমি আর দেখি

নাই।” কর্ণ বলিলেন, “পলাইয়া যাওয়া মহা পাপ, নচেৎ এতক্ষণে প্রাণ লইয়া সরিয়া পড়িতাম!” দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কৃপ, শল্য সকলকেই অভিমন্যুর হস্তে লাঞ্ছিত হইতে হইল। ইহাদের মধ্যে দুঃশাসন বড়ই গর্ব্ব করিয়াছিলেন, দারুণ আঘাতে রথে পড়িয়া তিনি খাবি খাইতে লাগিলেন। অশ্বত্থামাও কোন রকমে পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইলেন। দেখিতে দেখিতে অভিমন্যুর হাতে নয় হাজার রথ, এক হাজার অশ্ব, নয় শত হাতী এবং অসংখ্য পদাতি প্রাণত্যাগ করিল।

ন্যায়যুদ্ধে অভিমন্যুর সহিত কেহই একাকী পারিয়া উঠিতেছেন না দেখিয়া, কাপুরুষ দুর্য্যোধনের পরামর্শে দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও হার্দ্দিক্য এই ছয়জনে এক সঙ্গে অভিমন্যুকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু বালকের এমনই তেজ যে, ছয়জনের একজনও অক্ষত শরীরে ফিরিলেন না। তার পর ঘুরিয়া ফিরিয়া যত বার আসিলেন, তত বারই সকলকে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিতে হইল।

এইরূপে বার বার পরাজিত হইয়া দ্রোণ বলিলেন, “ঐ সিংহশিশুর হাতে অস্ত্র থাকিতে আর রক্ষা নাই। তোমরা কেহ উহার ঢাল, কেহ অসি, কেহ বা ধনুক কাটিয়া ফেল এবং উহার সারথিকে বধ কর; তাহা হইলেই উহাকে পরাস্ত করা সম্ভব হইবে।”

দ্রোণের পরামর্শে কর্ণ এক বাণে অভিমন্যুর ধনুক কাটিয়া ফেলিলেন, কৃতবর্ম্মা তাঁহার ঘোড়াগুলিকে মারিলেন আর

কৃপ তাঁহার সারথিকে বধ করিলেন। এইরূপে বিপন্ন হইয়া অভিমন্যু অসি ও ঢাল লইবামাত্র স্বয়ং দ্রোণ তাঁহার অসি এবং কর্ণ তাঁহার ঢাল চূর্ণ করিয়া দিলেন। চক্র হাতে লইলে তাঁহারা তাহাও খণ্ড খণ্ড করিলেন।

অভিমন্যুর আর কোন অস্ত্রই রহিল না। তিনি শেষে রক্তাক্ত দেহে গদা লইয়া ছুটিলেন। সম্মুখেই ছিল অশ্বত্থামার রথ। অশ্বত্থামা পলায়ন করিলে, অভিমন্যু দুইপাশের বহু রথ ও হস্তী নিঃশেষ করিয়া দুঃশাসনের পুত্রকে আক্রমণ করিলেন। তখন সেই বালকও গদা লইয়া অগ্রসর হইল। তার পর যুদ্ধ করিতে করিতে দুইজনেই ঠিক্‌রাইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন! সমস্ত দিনের পরিশ্রমে অভিমন্যু ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। দুঃশাসনের পুত্র অগ্রে উঠিয়া তাঁহার মস্তকে এমন কঠিন আঘাত করিল যে, সেই বীর শিশুর মোহনিদ্রা আর ভাঙ্গিল না।

হায় হায়! এমন মহাপাপ করিয়াও কৌরবেরা আনন্দে নৃত্য করিতে লজ্জা বোধ করিল না! কিন্তু পাণ্ডবদের হৃদয়ে যে দারুণ শেল বিদ্ধ হইল, তাহার অসহ্য যন্ত্রণায় তাঁহারা ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন।

এতক্ষণ অর্জ্জুন সংশপ্তকদিগের সহিত যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন। হঠাৎ তাঁহার মন অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিল। তিনি যুধিষ্ঠিরের অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া কৃষ্ণকে তাড়াতাড়ি রথ ফিরাইতে বলিলেন।

তার পর শিবিরে উপস্থিত হইয়া অর্জ্জুন যাহা দেখিলেন ও শুনিলেন, তাহাতে তাঁহার বুদ্ধি-বিবেচনা লোপ পাইবার উপক্রম হইল। যে বীরপুরুষ কত কষ্ট, কত বিপদ্ বুক পাতিয়া লইয়াছেন, কিছুতেই টলেন নাই, আজ তিনি 'অভিমন্যু আমার' বলিয়া বসিয়া পড়িলেন; দুঃখে তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। যুধিষ্ঠির, ভীম প্রভৃতি ত কাঁদিয়াই আকুল! তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিতে গিয়া শ্রীকৃষ্ণকে পর্য্যন্ত যার-পর-নাই বিচলিত হইতে হইল।

যাহা হউক, শেষে অর্জ্জুন যখন শুনিলেন, পাপাত্মা জয়দ্রথের কৌশলেই অভিমন্যু বার বার চেষ্টা করিয়াও চক্র-ব্যূহের বাহিরে আসিতে পারেন নাই, তখন রাগে তাঁহার মাথার চুলগুলি পর্য্যন্ত খাড়া হইয়া উঠিল! তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, "কাল সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই আমি জয়দ্রথকে বধ করিব। এ কথা যদি মিথ্যা হয়, তবে জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিয়া সকল যন্ত্রণা জুড়াইব।"

এই ভয়ানক প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া ভয়ে জয়দ্রথের মুখ শুকাইয়া গেল। তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে দুর্য্যোধনের কাছে গিয়া বলিলেন, "ভাই, আমাকে বিদায় দাও; আমি পলাইয়া বাঁচি।"

এ কথায় দুর্য্যোধন তাঁহাকে অনেক করিয়া সাহস দিলেন বটে, কিন্তু যতক্ষণ না দ্রোণ তাঁহাকে অভয় দান করিলেন, ততক্ষণ জয়দ্রথ নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না! দ্রোণ

বলিলেন, "কাল আমি এমন এক ব্যূহ প্রস্তুত করিব এবং তাহার মধ্যে তোমাকে এমন করিয়া লুকাইয়া রাখিব যে, অর্জ্জুন কোন মতেই তোমার সন্ধান পাইবে না।"

পরদিন দ্রোণ বাস্তবিকই এক আশ্চর্য্য ব্যূহ প্রস্তুত করিলেন। দীর্ঘে উহা চল্লিশ ক্রোশ। উহার ভিতরে আবার 'সূচী' নামক আর একটি ক্ষুদ্র ব্যূহ। সেইটি এমন ভাবে প্রস্তুত, যেন সহজে কাহারও চক্ষে না পড়ে। সেই ব্যূহে, কর্ণ, দুর্য্যোধন, কাম্বোজ, কৃতবর্ম্মা প্রভৃতি বীরগণ জয়দ্রথকে বেষ্টন করিয়া রহিলেন। আর প্রধান ব্যূহের চারিদিকে বড় বড় মহারথগণ অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিয়া উহার ভিতরে প্রবেশ করা এক প্রকার অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। স্বয়ং দ্রোণাচার্য্য ব্যূহের দ্বার রক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু যে অর্জ্জুনকে আটকাইবার জন্য এত আয়োজন, আজ তাঁহার সংহারমূর্ত্তি দেখিয়া বড় বড় বীরদেরও হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। তাঁহার গাণ্ডীবের টঙ্কারেই হাজার হাজার কৌরবসেনা অজ্ঞান হইয়া পড়িল। দুঃশাসন বহু হস্তী লইয়া অর্জ্জুনকে আটকাইতে আসিয়াছিলেন; তিনি পলাইয়া রক্ষা পাইলেন বটে, কিন্তু হাতীগুলার একটাও ফিরিল না। দুঃশসানকে উচিত শিক্ষা দিয়া অর্জ্জুন ব্যূহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। তার পর গুরু-শিষ্যে মহাযুদ্ধ বাধিল। কিন্তু দ্রোণকে পরাস্ত করিতে যতটা সময়ের প্রয়োজন, আজ

ততটা সময় নষ্ট করিতে অর্জ্জুন অক্ষম। সেই জন্য গুরুর পাশ কাটাইয়া তিনি রথ চালাইয়া দিলেন।

এইবার ঠিক যেন ভীমরুলের চাকে ঘা পড়িল। দলে দলে কত কৌরব বীর যে তাঁহাকে আক্রমণ করিল, তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু অর্জ্জুনের বাণে তাহাদের মাথা ধূলার ন্যায় উড়িতে লাগিল। বাণের মুখ হইতে যদিই বা কেহ কেহ রক্ষা পাইয়াছিল, রথের চাকা এড়ান কিন্তু তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইল। এই ভাবে কৌরব-সেনা মারিতে মারিতে অর্জ্জুন অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

সূচীব্যূহ তখনও অনেক দূরে। অর্জ্জুনের রথ বিদ্যুদ্বেগে ছুটিয়াছে, এমন সময় দুর্য্যোধন হঠাৎ কি যেন এক আশ্চর্য্য বলে বলী লইয়া রণস্থল কাঁপাইয়া তুলিলেন। আচার্য্য তাঁহার অঙ্গে আজ অভেদ্য কবচ বাঁধিয়া দিয়াছেন। তাহাতেই দুর্য্যোধনের এত তেজ! কিন্তু অর্জ্জুনের নিকট সে চালাকি খাটিল না। তিনি দেখিলেন, দুর্য্যোধনের হাত দুইটি খালি। তখন সেই হাত লক্ষ্য করিয়া কয়েকটি বাণ মারিতেই তাঁহার সকল দর্প চূর্ণ হইল।

দুর্য্যোধনকে পলাইতে দেখিয়া ভয়ে কৌরব-রথীদের বুক কাঁপিয়া উঠিল। ইহার পর কৃপ, কর্ণ, শল্য, অশ্বত্থামা প্রভৃতি আট জন মহারথ এক সঙ্গে অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিলেন; কিন্তু প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াও তাঁহাকে হটাইতে পারিলেন না।

এদিকে পাণ্ডবেরা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অর্জ্জুনের কোন সংবাদ পান নাই। যুধিষ্ঠির ব্যস্ত হইয়া তাঁহার সাহায্যের জন্য সাত্যকিকে পাঠাইয়া দিলেন।

ব্যূহদ্বারে পঁহুছিয়াই সাত্যকি দেখিলেন, দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধে ব্যস্ত আছেন। সেই সুযোগে তিনিও অর্জ্জুনের মত পাশ কাটাইয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলেন। কিন্তু দ্রোণকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নহে। পিছন্ পিছন্ তাড়া করিয়া তিনি চক্ষের নিমেষে সাত্যকিকে আক্রমণ করিলেন। তখন দুইজনে ভীষণ যুদ্ধ বাধিল। সেই যুদ্ধে দ্রোণকেই কিন্তু হারিতে হইল।

আচার্য্যকে হারাইয়া সাত্যকির উৎসাহ দশগুণ বাড়িয়া গেল। দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কৃতবর্ম্মা কেহই তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইতে সাহস করিলেন না। বড় বড় কৌরবরথিগণ ভয়েই অস্থির, যুদ্ধ করিবে কে? যাঁহারা অতি সাহস করিয়া সাত্যকির পথ আটকাইয়া ছিলেন, তাঁহাদের কাটা মুণ্ড মাটিতে গড়াইতে লাগিল। ভোজ ও কাম্বোজ রাজ বহু সৈন্য লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিলেন; শেষে প্রহারের জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে যুধিষ্ঠির সাত্যকির সাহায্যের জন্য ভীমকে পাঠাইলেন। ইহাতে ভীমের আনন্দ আর ধরে না! সিংহ-নাদ করিতে করিতে ব্যূহদ্বারে আসিয়াই তিনি দ্রোণকে পথ

ছাড়তে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু আচার্য্য সে কথায় কাণ না দিয়া বলিলেন, "আমার হাতে আজ তোমার রক্ষা নাই।"

তখন ভীম বলিলেন, "আচ্ছা, দেখা যাইবে। আমার কাছে 'গুরু' বলিয়া খাতির উপরোধ চলিবে না।" এই বলিয়া তিনি এমন জোরে গদা ছুড়িয়া মারিলেন যে, দ্রোণ লাফ দিয়া পলায়ন না করিলে, রথের সহিত তাঁহার বুড়া হাড়গুলিও গুঁড়া হইয়া যাইত।

ব্যূহে প্রবেশ করিয়া ভীম যে কি ভয়ানক কাণ্ড করিতে লাগিলেন, তাহা বলিয়া বুঝান যায় না। কৌরবেরা আজ জয়দ্রথের মাথা রক্ষা করিতে ব্যস্ত, কিন্তু ভীমের বিশাল গদার আঘাতে তাহাদের হাজার হাজার মাথা চারিদিকে ঠিকরাইয়া পড়িতে লাগিল। এক এক করিয়া দুর্য্যোধনের একত্রিশটি ভাইকে তিনি যমালয়ে পাঠাইলেন। কাহারও সাধ্য হইল না যে, তাঁহাকে বাধা দেয়। কর্ণ বার বার পলাইয়া শেষে ভীমের হাতে এমন শিক্ষা পাইলেন যে, বোধ হয়, জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাহা ভুলিতে পারেন নাই।

এইরূপে যুদ্ধ করিতে করিতে ভীম গিয়া সাত্যকির সহিত মিলিত হইলেন। তারপর কিছু দূরে অর্জ্জুনের রথ দেখিতে পাইয়া হুঙ্কারে আকাশ ফাটাইতে লাগিলেন।

তখন বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। অর্জ্জুন এতক্ষণ কেবল পথই পরিষ্কার করিয়াছেন। এইবার জয়দ্রথকে বধ করিতে না পারিলে আর রক্ষা নাই। কিন্তু

তাঁহাকে মারা কি সহজ কথা! কর্ণ, কৃপ, শল্য, অশ্বত্থামা প্রভৃতি তাঁহাকে মাঝখানে রাখিয়া এমন ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন যে, অর্জ্জুনকেও স্তম্ভিত হইতে হইল। তিনি স্পষ্টই বুঝিলেন, এই সকল বীরকে পরাজিত না করিয়া জয়দ্রথকে বধ করা অসম্ভব। এদিকে বেলাও আর নাই বলিলেই হয়। অর্জ্জুন মহা সমস্যায় পড়িলেন।

কিন্তু কৃষ্ণ যাঁহার সহায়, তাঁহার আবার ভাবনা কি? অর্জ্জুনের বিপদ্ বুঝিয়া তিনি মায়াবলে এমন করিয়া সমুদয় আকাশ ঢাকিয়া ফেলিলেন যে, সূর্য্যাস্ত সম্বন্ধে কাহারও আর সন্দেহ রহিল না।

তখন কৌরবদের উৎসাহ দেখে কে? যাঁহার ভয়ে দুর্য্যোধনের আহার-নিদ্রা বন্ধ, সেই প্রধান শত্রু অর্জ্জুনকে এখনই আগুনে ঝাঁপ দিয়া মরিতে হইবে, ইহা কি কম আনন্দের কথা! তাঁহারা অস্ত্র ফেলিয়া নাচিতে নাচিতে ছুটিয়া আসিলেন।

জয়দ্রথ এতক্ষণ লুকাইয়া ছিলেন। অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা রক্ষার সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে, আর কিসের ভয়! কিন্তু তখনও যেন তাঁহার সন্দেহ একেবারে দূর হয় নাই। সূর্য্য সত্য সত্য অস্ত গিয়াছেন, কি না, দেখিবার জন্য তিনি বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

এইবার মহা সুযোগ উপস্থিত। অর্জ্জুন কালবিলম্ব না করিয়া কৃষ্ণের ইঙ্গিতে একবাণে জয়দ্রথের মাথা কাটিয়া

ফেলিলেন এবং উহা মাটিতে পড়িবার পূর্ব্বেই বাণে বাণে উড়াইয়া লইয়া সমন্তপঞ্চক তীর্থে তাঁহার পিতা বৃদ্ধক্ষত্রের কোলে ফেলিয়া দিলেন। বৃদ্ধক্ষত্র তখন তপস্যা করিতে ছিলেন। হঠাৎ কাটামুণ্ড কোলে পড়ায় তিনি চমকিয়া উঠিলেন! আর সেই মুণ্ড মাটিতে পড়িতে না পাড়তে তাঁহার মুণ্ডও উড়িয়া গেল!

এক সময়ে বৃদ্ধক্ষত্রের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া শিব এই বর দিয়াছিলেন,—'যে কেহ জয়দ্রথের মুণ্ড মাটিতে ফেলিবে, তাহার মস্তকও সেই সঙ্গে উড়িয়া যাইবে।' শ্রীকৃষ্ণ ইহা জানিতেন এবং তাঁহারই পরামর্শে অর্জ্জুন জয়দ্রথের মাথা উড়াইয়া লইয়া বৃদ্ধক্ষত্রের কোলে ফেলিয়াছিলেন।

অর্জ্জুনের কাজ শেষ হইলে শ্রীকৃষ্ণের কৌশলে সূর্য্যদেব আবার দেখা দিলেন! তখন কৌরবদের মনে কিরূপ ভয়ের সঞ্চার হইল, তাহা বুঝিতেই পার।

জয়দ্রথের মৃত্যুতে দুর্য্যোধন চক্ষু লাল করিয়া দ্রোণকে খুব গালাগালি করিতে লাগিলেন। দ্রোণ বলিলেন, "এখন কেন আমাকে দোষ দাও? অর্জ্জুনকে যদি ভাল করিয়া জানিতে, তবে কখনই সাহস করিয়া যুদ্ধে আসিতে না। যাহাকে দেবতারাও ভয় করেন, মানুষের সাধ্য কি যে তাহাকে পরাজিত করে? যাহা হউক, যতক্ষণ প্রাণ আছে, আমি আর অস্ত্র ছাড়িব না।" এই বলিয়া তিনি আবার ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।

সে রাত্রে কেহই আর শিবিরে ফিরিল না। মশালের আলোতে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। দ্রোণ আর অর্জ্জুনে, সাত্যকি আর কর্ণে, যুধিষ্ঠির আর দুর্য্যোধনে, অশ্বত্থামা আর ঘটোৎকচে, শকুনি আর নকুলে অতি ভয়নাক যুদ্ধ হইল। ভীমের কথা আর কি বলিব! তাঁহার হাঁটুর গুতা খাইয়াই কত লোক মাটিতে পুতিয়া গেল! লাথির চোটেই কত লোকের পাঁজর ভাঙ্গিয়া গেল! দুর্য্যোধনের আর নয়টি ভাইকে তিনি এমন করিয়া গুঁড়া করিয়া ফেলিলেন যে, তাঁহাদিগকে চিনিতে পারাই ভার।

চারিদিকেই এইরূপ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ, কিন্তু সে রাত্রে ঘটোৎকচের বীরত্বের কাছে আর সকলকেই হার মানিতে হইল। ঘটোৎকচ একাই যেন একশত। সে যে কখন্ কোথায় থাকে, কখন্ কাহার ঘাড়ে পড়ে, কখন্ কাহার মাথা ভাঙ্গে, বুঝাই ভার! সে যে-দিকে চায়, সেই দিক্ অমনি হু-হু শব্দে জ্বলিয়া উঠে, আর সেই আগুনে দলে দলে কৌরবসেনা ভস্ম হইতে থাকে।

ঘটোৎকচের কাণ্ড দেখিয়া বড় বড় বীরেরাও ভয় পাইলেন। তাহাকে আট্কাইতে না পারিলে আর নিস্তার নাই, কিন্তু আট্কায় কে?

ইহাতে দুর্য্যোধন নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। কর্ণকে বলিলেন, "ইন্দ্রের অস্ত্রদ্বারা এখনই উহাকে বধ কর, নচেৎ আর রক্ষা নাই।"

কর্ণ বলিলেন, "তাহা হইলে অর্জ্জুনকে মারা যে অসম্ভব হইবে!"

এ কথায় দুর্য্যোধন বলিলেন, "আজ বাঁচিলে তবে ত অর্জ্জুনকে মারিবে! এখনই যে সব শেষ হয়!"

তখন আর উপায় নাই দেখিয়া কর্ণ ইন্দ্রের সেই এক-পুরুষঘাতিনী অস্ত্র লইয়া ঘটোৎকচকে বধ করিলেন! কি বিশাল তাহার দেহ! তাহার চাপেই প্রায় এক অক্ষৌহিণী কৌরবসেনা নষ্ট হইল।

ঘটোৎকচের মৃত্যুতে যুধিষ্ঠির প্রভৃতির দুঃখের অবধি রহিল না। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু আনন্দে অধীর! অর্জ্জুন আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহার আনন্দের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, কৃষ্ণ বলিলেন, "এতদিন কর্ণ তোমাকে মারিবার জন্য যে অস্ত্র লুকাইয়া রাখিয়াছিল, আজ ঘটোৎকচ-বধে উহার কার্য্য শেষ হইয়াছে। ইন্দ্রের অস্ত্র আবার ইন্দ্রের নিকট ফিরিয়া গিয়াছে। এত সহজে তোমার বিপদ্ কাটিল, ইহা কি কম আনন্দের কথা!"

ঘটোৎকচের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া কৌরবেরাও আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। কিন্তু কর্ণের মুখ আজ বিষাদে মলিন! হায় হায়! অর্জ্জুন-বধের সকল আশাই ফুরাইল।

ক্রমে রাত্রি শেষ হইয়া আসিলে সৈন্যগণ শিবিরে না ফিরিয়া রণস্থলেই কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিল।

পরদিন সকাল হইতে না হইতে আবার যুদ্ধ বাধিল। আজ দ্রোণের তেজ একেবারেই অসহ্য। দেখিতে দেখিতে

তাঁহার হস্তে অসংখ্য পাণ্ডব-সেনা মারা পড়িল। বড় বড় রথীদের মধ্যে দ্রুপদ আর বিরাট প্রায় একই সময়ে নিহত হইলেন ! ইহাতে ধৃষ্টদ্যুম্ন রাগে আগুন হইয়া এই প্রতিজ্ঞা করিলেন,—'আজ দ্রোণকে না মারিয়া যদি ফিরি, তবে যেন আমার স্বর্গের পথ বন্ধ হয়।'

এতক্ষণ অর্জ্জুনের সহিত আচার্য্যের যুদ্ধ চলিতেছিল, এখন ভীম আর ধৃষ্টদ্যুম্ন আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও তাঁহারা দ্রোণের অস্ত্র নিবারণ করিতে পারিলেন না।

ইহাতে কৃষ্ণ ব্যস্ত হইয়া অর্জ্জুনকে বলিলেন, "তুমি যখন কোন ক্রমেই গুরুহত্যা করিবে না, তখন কৌশলে অস্ত্রহীন করিয়া দ্রোণকে মারিতে হইবে। কেহ যদি তাঁহার কাছে গিয়া বলে যে, 'অশ্বত্থামা মারা গিয়াছে', তাহা হইলে শোকে কাতর হইয়া তিনি নিশ্চিতই অস্ত্র ফেলিয়া দিবেন।"

কৃষ্ণের কথা শুনিয়া অর্জ্জুন শিহরিয়া উঠিলেন। ছিঃ ছিঃ ! এমন অন্যায় কাজ কি করিতে আছে !

ভীম কিন্তু তখনই অবন্তীরাজের অশ্বত্থামা নামক হাতীটা বধ করিয়া দ্রোণের নিকট আসিয়া বলিলেন, "অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছে।"

দ্রোণের বিশ্বাস হইল না। এ কথা সত্য, কি না, তিনি যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরের মুখ দিয়া এই প্রথম মিথ্যা কথা

বাহির হইল। শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষামত তিনি বলিলেন, "অশ্বত্থামা হত ইতি গজ।"

'অশ্বত্থামা হত' এই দুইটি কথা দ্রোণ স্পষ্টই শুনিতে পাইলেন, কিন্তু 'ইতি গজ' কথা দুইটি যুধিষ্ঠির এমন মৃদুস্বরে বলিলেন যে, তাহা দ্রোণের কর্ণেই প্রবেশ করিল না!

যুধিষ্ঠিরের কথা শুনিয়া পুত্রের মৃত্যু-সম্বন্ধে তাঁহার আর কোন সন্দেহ রহিল না। তখন শোকে নিতান্ত কাতর হইয়া তিনি রথের উপর অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। তাঁহার হাতের অস্ত্র খসিয়া পড়িল।

ধৃষ্টদ্যুম্ন আজ অতি কঠিন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। সুতরাং এমন সুযোগ কি তিনি ছাড়িতে পারেন? দ্রোণ অজ্ঞান হইবামাত্র তিনি অস্ত্র লইয়া ছুটিলেন। সকলে বার বার নিষেধ করিতে লাগিলেন; তাঁহাকে নিবারণ করিবার জন্য অর্জ্জুন পর্য্যন্ত ছুটিয়া আসিলেন, কিন্তু তিনি কাহারও কথা না শুনিয়া নিষ্ঠুরভাবে দ্রোণকে বধ করিলেন!

আচার্য্যের মৃত্যুতে কৌরবদের মধ্যে অতি ভীষণ ত্রাসের সঞ্চার হইল! তাহারা হতবুদ্ধির ন্যায় চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল! আর যে কেহ জীবন্ত ফিরিবে, সে আশা রহিল না।

এই ভয়ানক কথা শুনিয়া অশ্বত্থামা পাগলের মত ছুটিয়া আসিলেন এবং পাণ্ডবদলকে একেবারে শেষ করিবার জন্য বিখ্যাত 'নারায়ণ' অস্ত্র ছাড়িলেন।

ইহা অতি সাংঘাতিক অস্ত্র। এ অস্ত্র আসিতে দেখিয়াও যদি কেহ হাতের অস্ত্র ফেলিয়া না দেয়, তবে তাহার মরণ নিশ্চিত।

শ্রীকৃষ্ণ ইহার সকল রহস্যই জানিতেন। তাঁহার কথায় পাণ্ডবপক্ষের সকলে আপন আপন অস্ত্র ত্যাগ করিয়া রথ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন। কাজে কাজেই তাঁহাদের সকল বিপদ্ কাটিয়া গেল।

নারায়ণ অস্ত্র ব্যর্থ হইল দেখিয়া অশ্বত্থামা সেদিন নিতান্ত বিষণ্ণ মনে শিবিরে ফিরিয়া গেলেন।

কর্ণপর্ব্ব

দ্রোণের মৃত্যুতে কৌরবদল ভয়ে একেবারে জড়সড় হইয়া পড়িল। কিন্তু পরদিন কর্ণ যখন প্রধান সেনাপতি হইয়া খুব আস্ফালন আরম্ভ করিলেন, তখন সকলের উৎসাহ আবার ফিরিয়া আসিল। দুর্য্যোধন ভাবিলেন, এবার পাণ্ডবদের জারিজুরি ফুরাইল! ভীষ্ম-দ্রোণ স্নেহবশতঃ তাহাদিগকে মারেন নাই। কিন্তু কর্ণ কাহাকেও ছাড়িবেন না।

দুর্য্যোধনের দলের লোকেরাও ভাবিল, কর্ণের ন্যায় বীর একদিনেই পাণ্ডবদের শেষ করিবেন।

আর বাস্তবিক কর্ণ সেদিন যে ভাবে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, তাহাতে পাণ্ডবদের ভয় পাইবারই কথা। তাঁহার বাণের তেজে লোকে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিল। পাণ্ডব-সেনার রক্তে সমস্ত মাঠ লাল হইয়া উঠিল। রক্তের কাদায় পা বাড়াইবারও স্থান রহিল না। নকুল একবার খুব সাহস করিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু কর্ণের হাতে তাঁহার দুর্গতির একশেষ হইল। কুন্তীর কাছে কর্ণ যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সে কথা মনে না পড়িলে, হয় ত তিনি সেদিন নকুলকে মারিয়াই ফেলিতেন।

রণস্থলে কর্ণ আশ্চর্য্য বীরত্ব দেখাইলেন বটে, কিন্তু ভীমকে নিকটে না দেখিয়া তাঁহার প্রাণ আতঙ্কে পূর্ণ হইল।

আতঙ্ক ত হইতেই পারে। ভীম কি চুপ্ করিয়া থাকিবার লোক? কর্ণ যখন একদিক্ হইতে পাণ্ডব-সেনা শেষ করিতে ব্যস্ত, ভীম তখন কৌরব-সেনার রক্তে স্রোত বহাইতে লাগিলেন।

আর সেদিন যুধিষ্ঠিরও কিছু কম যুদ্ধ করেন নাই। দুর্য্যোধনের বাণ কাটিয়া, শক্তি কাটিয়া, গদা কাটিয়া, তাঁহাকে মহা বিপাকে ফেলিলেন। কৌরবদলে চারিদিকেই 'ত্রাহি' 'ত্রাহি' ডাক পড়িয়া গেল।

এদিকে যে এত সব কাণ্ড হইতেছে, অর্জ্জুন তাহার কিছুই জানেন না; সংশপ্তকদিগকে প্রায় শেষ করিয়া যখন তিনি ফিরিয়া আসিলেন, তখন আর অধিক বেলা ছিল না। কর্ণের হাতে পাণ্ডবদের দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া রাগে তাঁহার চক্ষু দিয়া আগুন ছুটিতে লাগিল। তার পর অর্জ্জুন গাণ্ডীব ধরিতে না ধরিতে আকাশ ভরিয়া আগুনের বৃষ্টি! সে আগুনে কৌরবদল ছারখার হইতে বাকী রহিল না।

বেলা শেষ হওয়ায় যুদ্ধ থামিল বটে, কিন্তু অর্জ্জুন সেই অল্প সময়ের মধ্যেই যাহা করিলেন, কর্ণ সমস্ত দিনেও তাহা পারেন নাই।

পরদিন রণস্থলে আবার বিষম যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দুর্য্যোধনের অনুরোধে মদ্ররাজ শল্য আজ কর্ণের রথের সারথী হইয়াছেন। কিন্তু কার্য্যভার গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে শল্য একথা স্পষ্টই বলিয়া লইয়াছেন যে, ইচ্ছামত তিনি

কর্ণের মুখের উপর যাহা খুসী বলিবেন। কর্ণ তাহাতে কিছুমাত্র আপত্তি করিতে পারিবেন না।

রথচালনায় শল্য প্রায় কৃষ্ণের সমান। অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে এত বড় বীরের সাহায্য পাওয়া সহজ কথা নয়। কাজে কাজেই তাঁহার কথায় দুর্য্যোধন ও কর্ণকে রাজী হইতে হইল।

শল্যকে পাইয়া কর্ণ আজ ধরাকে সরা জ্ঞান করিতে লাগিলেন। শল্য কিন্তু পদে পদেই যাহা তাহা বলিয়া তাঁহার তেজ কমাইবার চেষ্টাতেই ব্যস্ত।

রথে উঠিয়া কর্ণ যখন বলিলেন, "আজ পাণ্ডব-বংশ নির্ম্মূল না করিয়া ছাড়িব না." তখন শল্য বলিলেন, "তুমি কি পাগল হইয়াছ! স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রও যাঁহাদিগকে ভয় করিয়া চলেন, তুমি সেই পাণ্ডবদিগকে বধ করিতে চাও! তোমার সাহস ত কম নয়!"

কর্ণ বলিলেন, "অর্জ্জুনকে আমি গ্রাহ্যই করি না। আজ যদি দেবতারাও চেষ্টা করেন, তবুও তাহাকে বাঁচাইতে পারিবেন না। দুর্য্যোধনের কাছে আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, অর্জ্জুনকে না মারিয়া আজ ফিরিব না!"

শল্য বলিলেন, "তুমি যে খুব বাক্যবীর, তাহা সকলেই জানে! কিন্তু তুমি মুখে যাহা বল, কাজে যদি তাহার সিকিও করিতে পারিতে, তবেও বুঝিতাম। অর্জ্জুনের সঙ্গে তোমার তুলনা! বিড়ালে ইঁদুরে, বাঘে কুকুরে, সিংহে

শৃগালে যে প্রভেদ, অর্জ্জুনে আর তোমাতেও ঠিক সেইরূপ! আমি নিশ্চিত জানি, আজ আর তোমার রক্ষা নাই।”

এ কথা শুনিয়া কর্ণ রাগে আগুন হইয়া উঠিলেন! তিনি বলিলেন, “আগে কথা দিয়াছি বলিয়াই আজ তুমি বাঁচিয়া গেলে ; নয় ত তোমাকে এমন শিক্ষা দিতাম যে, কোন কালেও ভুলিতে পারিতে না!”

তখন শল্য হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “বাপ্ রে! এত গরম হইলে চলিবে কেন? এখন মাথাটা ঠাণ্ডা রাখা নিতান্ত দরকার, নচেৎ অর্জ্জুনের বাণ খাইয়া পলাইবার সময় যে দিগ্‌ভ্রম হইবে।”

কর্ণ আর বেশী কিছু বলিলেন না ; মনে মনে ভাবিলেন, “মূর্খের সহিত কথা কাটাকাটি করা বৃথা।”

ইহার পর রথ পাণ্ডব-সৈন্যের নিকটস্থ হইলে কর্ণ ‘অর্জ্জুন’ ‘অর্জ্জুন’ বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন।

শল্য বলিলেন, “বৃথা কেন গলা ফাটাইতেছ? অর্জ্জুন ঠিক সময়েই আসিবে। এখন সে তোমার জন্য অস্ত্র শানাইতেছে।”

এইরূপে শল্য যখনই একটু সুবিধা পান, তখনই কর্ণের মেজাজ বিগ্‌ড়াইয়া দিয়া তাঁহার তেজ কমাইতে চেষ্টা করেন। শল্যের উপহাসে কর্ণকে একেবারে জ্বালাতন হইতে হইল।

কিন্তু কর্ণের তেজ কি সহজে কমে! রণস্থলে আজ তাঁহাকে ঠেকাইয়া রাখাই ভার। তাঁহার বাণে হাজারে

হাজারে—লাখে লাখে পাণ্ডব-সেনা নিহত হইল! সাত্যকি, ভীম, ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র এবং এই রকম আরও অনেক বড় বড় যোদ্ধা একসঙ্গে মিলিয়াও তাঁহাকে নিবারণ করিতে পারিলেন না!

ইহার পর কর্ণ আর যুধিষ্ঠিরে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল! সেই যুদ্ধে যুধিষ্ঠির অদ্ভুত ক্ষমতা দেখাইলেন বটে, কিন্তু শেষে তাঁহাকে বিলক্ষণ জব্দ হইতে হইল। তাঁহার সাহায্যের জন্য সাত্যকি, যুযুৎসু প্রভৃতি বীরগণ ছুটিয়া আসিয়া কর্ণকে আক্রমণ করিলেন। কর্ণ কিন্তু একটুও দমিলেন না; বাণে বাণে সকলকে অস্থির করিয়া যুধিষ্ঠিরের রথ, ধ্বজা, ধনুক, বর্ম্ম সমস্তই কাটিয়া ফেলিলেন।

যুধিষ্ঠিরের দুর্দ্দশার অবধি রহিল না। কুন্তীর কথা মনে পড়াতেই কর্ণ তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন। নচেৎ আজ কি আর তাঁহার রক্ষা ছিল!

এই সময় ভীমের বিক্রমে রণস্থলের আর এক দিকে যেন প্রলয় উপস্থিত হইল। কৌরবেরা প্রাণভয়ে পলায়ন করিতেছে দেখিয়া কর্ণ তাহাদিগকে সাহস দিতে দিতে ছুটিয়া ভীমের উপর গিয়া পড়িলেন! কিন্তু এত যে তাঁহার তেজ, ভীমকে দেখিয়া তাহার আর চিহ্নমাত্রও রহিল না। ভীমের কঠিন অস্ত্র সহ্য করা আজ কর্ণের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। তিনি রথের উপর অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। তখন বেগতিক দেখিয়া শল্যকে রথ লইয়া পলাইতে হইল।

কর্ণের যে এমন দুর্দ্দশা হইবে, ইহা কেহ কল্পনাও করে নাই। দুর্য্যোধন আর কাহাকেও সম্মুখে না পাইয়া ভীমকে আটকাইবার জন্য তাড়াতাড়ি তাঁহার ভাইগুলিকে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু দুরন্ত বাঘের মুখে হরিণ শিশুর যে দশা হয়, ভীমের হাতে পড়িয়া তাহাদের ছয় জনের ঠিক সেইরূপ হইল। বাকী কয়েকটি কোন রকমে পলাইয়া বাঁচিল।

ইহার পর কর্ণ আবার আসিলেন। এবারেও ভীমের প্রহারে তাঁহাকে চারিদিক্ অন্ধকার দেখিতে হইল।

শেষে ভীমকে কোন রকমে আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া মনের ঝাল মিটাইবার জন্য কর্ণ যুধিষ্ঠিরকে গিয়া পুনর্ব্বার আক্রমণ করিলেন এবং সেই নিরীহ ভালমানুষটিকে যত রকমে উৎপীড়ন করা সম্ভব, তাহার কোনটাই বাকি রাখিলেন না।

যুধিষ্ঠিরের বিপদ্ দেখিয়া শল্য কর্ণকে বলিলেন, "আজ তোমার অর্জ্জুনকে মারিবার কথা! সে চেষ্টা না করিয়া বাজে যুদ্ধে মিছামিছি কেন ক্লান্ত হইতেছ? ওদিকে ভীমের হাতে পড়িয়া দুর্য্যোধনের প্রাণ যে একেবারে ওষ্ঠাগত। সর্ব্বাগ্রে রাজাকে বাঁচাও।"

কর্ণ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; যুধিষ্ঠিরকে ছাড়িয়া দুর্য্যোধনের সাহায্যের জন্য ছুটিলেন।

এদিকে শল্যের কৌশলে রক্ষা পাইয়া যুধিষ্ঠির শিবিরে

ফিরিয়া যাতনায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন। সেদিন আবার যুদ্ধে যাওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইল।

অর্জ্জুন এতক্ষণ সংশপ্তকদিগকে লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন। তাহাদিগকে নিঃশেষ করিয়া ফিরিতেছেন, এমন সময় অশ্বত্থামা বহু সৈন্য লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। যাহা হউক, সেজন্য অর্জ্জুনকে বেশী কষ্ট পাইতে হইল না। তিনি সারথির মাথা কাটিতে না কাটিতে ঘোড়াগুলি ভয় পাইয়া রথশুদ্ধ অশ্বত্থামাকে একেবারে রণস্থলের বাহিরে লইয়া গেল! তাঁহার সৈন্যদলের অধিকাংশই সেখানে পড়িয়া রহিল; আর বাকি কয়েকজন 'বাপ্‌ বাপ্‌' ডাক ছাড়িতে ছাড়িতে পলাইয়া বাঁচিল।

তারপর ভীমের মুখে যুধিষ্ঠিরের নিগ্রহের কথা শুনিয়া অর্জ্জুন তাড়াতাড়ি শিবিরে চলিয়া গেলেন। সেখানে যুধিষ্ঠিরকে দেখিয়া তাঁহার বড়ই কষ্ট হইল। ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বে তিনি এই প্রতিজ্ঞা করিলেন,—'আজ কর্ণকে না মারিয়া কোন মতেই ছাড়িব না।'

এদিকে ভীমের যুদ্ধের আর শেষ নাই। কৌরব-সেনা মারিতে মারিতে তাঁহার লক্ষ্য এমন স্থির হইয়াছে যে, আর একটা বাণও বৃথা যায় না। কোন কোন বাণে আবার এক সঙ্গে অনেকগুলা মাথা লুটাইয়া পড়ে। তিনি যতই শত্রুবধ করিতেছেন, তাঁহার উৎসাহ যেন ততই বাড়িয়া উঠিতেছে।

এই সময় অর্জ্জুন আর এক দিক্ হইতে কৌরব-সেনা ছারখার করিতে করিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অস্ত্রের আজ কি ভীষণ গর্জ্জন! উৎসাহে ভীমের বুক দশ হাত ফুলিয়া উঠিল। তারপর দুই ভাইয়ে মিলিয়া রণস্থলে ঠিক যেন ধূলা উড়াইতে লাগিলেন। কাহারও আর এটুকু বুঝিবার শক্তি রহিল না যে, 'বাঁচিয়া আছি, না মরিয়া গিয়াছি!'

এতক্ষণ কর্ণ পাণ্ডব-সেনা বধ করিতেই ব্যস্ত ছিলেন; হঠাৎ অর্জ্জুনের অস্ত্রের মহাশব্দে তিনি চমকিয়া উঠিলেন এবং তাড়াতাড়ি সেই দিকে রথের মুখ ফিরাইতে বলিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে দুঃশাসন ছুটিয়া আসিয়া ভীমকে আক্রমণ করিলেন।

ভীম ত তাহাই চান! দুঃশাসনকে নিকটে পাইয়া তিনি এক বাণে তাঁহার রথের ধ্বজা এবং আর এক বাণে তাঁহার সারথিকে কাটিয়া ফেলিলেন। তারপর ভীষণ এক শক্তি ছুড়িয়া মারিলেন। দুঃশাসন সে শক্তি খণ্ড খণ্ড করিয়া এমন তেজের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন যে, ভীমকেও একবার বিচলিত হইতে হইল। যাহা হউক শেষে গদা ঘুরাইতে ঘুরাইতে ভীম চীৎকার করিয়া বলিলেন, "এইবার সামলাও।'"

তাঁহার মুখের কথা শেষ না হইতেই সেই বিশাল গদা বজ্রের ন্যায় সশব্দে ছুটিয়া গিয়া দুঃশাসনের মাথার

উপর পড়িল। চোখে ধোঁয়া দেখিয়া তিনি রথ হইতে বহু দূরে ঠিক্‌রাইয়া পড়িলেন।

সেই পাপাত্মার হস্তে সভামধ্যে দ্রৌপদীর নির্য্যাতনের কথা ভীম একটি দিনের জন্যও ভুলেন নাই। সেই সময় তিনি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার পরিষ্কার মনে আছে। দুঃশাসন পড়িবামাত্র ভীম রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "আজ আমি আমার প্রতিজ্ঞা পালন করিব; যাহার শক্তি থাকে আসিয়া বাধা দিক্।" এই বলিয়া তিনি তখনই দুঃশাসনকে দুই পায়ে পেষণ করিয়া তীক্ষ্ণ অস্ত্রে তাঁহার বুক চিরিয়া ফেলিলেন। তারপর দুই হাত ভরিয়া রক্ত উঠাইয়া পান করিতে করিতে বলিলেন, 'আঃ, ঠিক যেন অমৃত!'

ভীমের কাণ্ড দেখিয়া সকলেই একেবারে হতবুদ্ধি! হঠাৎ কোন দুরন্ত রাক্ষস দেখিলেও বোধ হয় লোকে এতটা ভয় পায় না। অন্যের কথা দূরে থাক, স্বয়ং কর্ণও এমন থতমত খাইয়া গেলেন যে, কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত অস্ত্র ধরাই তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল।

এদিকে ভীম দুঃশাসনকে মারিয়া ফিরিয়া আসিবার পথে দুর্য্যোধনের আরও দশটি ভাইকে শেষ করিলেন। তারপর মনের আনন্দে রথে উঠিয়া বসিলেন।

এই সময় কর্ণের পুত্র বৃষসেন খুব উৎসাহের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই অর্জ্জুনের মনে অভিমন্যুর

শোক উথলিয়া উঠিল। তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন, "হে কর্ণ, হে কৃপ, হে অশ্বত্থামা, অভিমন্যুর প্রতি তোমাদের নিষ্ঠুর অত্যাচারের কথা আজ স্মরণ কর। সেই একটি বালককে মারিতে তোমরা গলদ্ঘর্ম্ম হইয়াছিলে। আজ তোমাদের সাক্ষাতেই আমি বৃষসেনকে মারিব। যদি শক্তি থাকে, আসিয়া উহাকে বাঁচাও।"

অর্জ্জুনের কথায় কর্ণের মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। প্রাণাধিক পুত্রকে বাঁচাইবার জন্য তিনি পাগলের ন্যায় ছুটিয়া আসিলেন এবং অর্জ্জুনকে যত রকমে আক্রমণ করা সম্ভব, সবই করিলেন; কিন্তু হায়! কিছুতেই বৃষসেনকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। তাঁহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া অর্জ্জুন অভিমন্যুর মৃত্যুর প্রতিশোধ লইলেন।

এই ব্যাপারে কর্ণের বুক ত ভাঙ্গিয়া গেলই, অশ্বত্থামাও এমন ব্যথিত হইলেন যে, আর কালবিলম্ব না করিয়া দুর্য্যোধনের হাত দুইটি ধরিয়া বলিলেন, "দোহাই মহারাজ, ক্ষান্ত হও। এই সর্ব্বনেশে যুদ্ধে আর কাজ নাই। আমাদের সবই ত গিয়াছে! কর্ণের মৃত্যুর পর তোমাকেও রক্ষা করা অসম্ভব হইবে! তুমি অনুমতি দাও, পাণ্ডবদিগকে আমি শান্ত করি। আমার অনুরোধ তাঁহারা কখনই অগ্রাহ্য করিবেন না।" কিন্তু দুর্য্যোধনের স্কন্ধে দুষ্ট সরস্বতী চাপিয়া আছেন। এমন হিত উপদেশ তিনি শুনিবেন কেন?

এইবার যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল, বাস্তবিক তাহা অতি

ভয়ঙ্কর। সেই অর্জ্জুন, সেই কর্ণ; পূর্ব্বেও তাঁহাদের যুদ্ধ দেখা গিয়াছে। কিন্তু আজ যেন জীবনের আশা ছাড়িয়া দিয়া শেষ যুদ্ধের জন্য তাঁহারা ক্ষেপিয়া উঠিয়াছেন।

উঃ, কি ভীষণ বাণবৃষ্টি! বাণের পর বাণ, আবার বাণ, চারিদিকেই বাণের খেলা! বাণে বাণে ঝড় বহিতেছে, আগুন ছুটিতেছে,—পৃথিবী তোলপাড় : আকাশে পাখীদের পর্য্যন্ত চলাফেরা বন্ধ।

কর্ণ ও অর্জ্জুনের সর্ব্বাঙ্গ জর্জ্জরিত; ফিন্‌কি দিয়া রক্ত ছুটিতেছে; রক্তে রক্তে চারিদিক্ লাল হইয়া উঠিয়াছে। কৃষ্ণ ও শল্য আজ রক্তে মাখামাখি!

এই ভাবে কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলিলে, অর্জ্জুন এমন ভয়ানক এক বাণ মারিলেন যে, তাহার তেজে গাছ-পালা পাহাড়-পর্ব্বত পুড়িয়া ছাই হইল; চারিদিক্ ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল! 'আগুন' 'আগুন' চীৎকার করিতে করিতে কে যে কোথায় লুকাইল, তাহার ঠিকানা নাই।

কিন্তু কর্ণের তাহাতে কি ভ্রূক্ষেপ আছে? চক্ষের পলকে বরুণ-বাণে তিনি আকাশে মেঘের সৃষ্টি করিলেন। তারপর এমন বৃষ্টি যে, সর্ব্বত্র জলে জলময়। সে প্লাবনে অর্জ্জুনের আগুন ত নিভিলই, পৃথিবীও বুঝি ডুবিয়া যায়!

কৌরবেরা ভাবিল, এইবার অর্জ্জুনের দর্প চূর্ণ। কিন্তু অর্জ্জুন কি সহজ বীর। তিনি কি-এক অস্ত্র ছাড়িলেন, অমনি যেন ফুৎকারে সমস্ত জল কোথায় উড়িয়া গেল।

তারপর অর্জ্জুন ইন্দ্রের মহা অস্ত্র ধনুকে যুড়িলেন। সেই এক অস্ত্র হইতে হাজার রকমের হাজার অস্ত্র ভয়ানক গর্জ্জন করিতে করিতে কর্ণের দিকে ছুটিয়া চলিল।

পাণ্ডবেরা ভাবিল, এইবার কর্ণের দফা রফা। কিন্তু কর্ণ কি অত সহজে হারিবার পাত্র? তাঁহার নিকট বিখ্যাত ভার্গবাস্ত্র ছিল। তাহার দ্বারা তিনি অর্জ্জুনের সকল অস্ত্র খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিলেন এবং সাঙ্ঘাতিক এক বাণ ধনুকে যুড়িয়া স্পর্দ্ধার সহিত বলিলেন, "অর্জ্জুন, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়।"

কি সর্ব্বনাশ! সেই বাণের ভিতর এক প্রকাণ্ড সাপ। খাণ্ডব-দাহন কালে সেই যে তক্ষকের পুত্র অশ্বসেন পলাইয়া বাঁচিয়াছিল, অর্জ্জুনকে মারিবার জন্য আজ সে সাপ হইয়া কর্ণের বাণের মধ্যে লুকাইয়া রহিয়াছে। আর বুঝি অর্জ্জুনের রক্ষা নাই!

কি ভীষণ তেজেই সে বাণ ছুটিয়া চলিল। আর তাহার মুখ দিয়া কি ভয়ানক আগুনই না বাহির হইতে লাগিল! এখন উপায়?

কৃষ্ণ থাকিতে আবার উপায়ের অভাব? তিনি পায়ের চাপে রথখানিকে এমন করিয়া বসাইয়া দিলেন যে, কর্ণের বাণ অর্জ্জুনের গায়ে না লাগিয়া তাঁহার মাথার মুকুটে গিয়া লাগিল। ইহাতে মুকুটখানি চূর্ণ হইল বটে, কিন্তু অর্জ্জুনের কোনই অনিষ্ট হইল না।

ব্যাপার দেখিয়া কর্ণ ত অবাক্। কৃষ্ণ যে এভাবে অর্জ্জুনকে বাঁচাইবেন, ইহা তিনি কল্পনাও করেন নাই।

ইহার পর হইতে কর্ণের মনে কেমন যেন একটা ভয়ের সঞ্চার হইল। এদিকে অর্জ্জুনের তেজ ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। তাঁহার প্রহারে অস্থির হইয়া কর্ণও প্রহার করিতে ত্রুটি করিলেন না বটে, কিন্তু কিছুতেই তিনি আর অর্জ্জুনকে আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না। অর্জ্জুন বাণে বাণে তাঁহার হাত, পা, নাক, কাণ, চোখ এবং সারা শরীর এমন করিয়া বিদ্ধ করিলেন যে, শেষে রথের উপরেই তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন।

এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ ও ভীম কর্ণকে মারিবার জন্য অর্জ্জুনকে বার বার উৎসাহ দিতে লাগিলেন। কিন্তু যে শত্রু আত্ম-রক্ষায় অসমর্থ, বীরহৃদয় অর্জ্জুন তাঁহাকে কেমন করিয়া বধ করিবেন!

জ্ঞান হইলে কর্ণ ও অর্জ্জুনে আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কিন্তু কর্ণের আর যেন সে তেজই নাই। এই সময়ে পরশুরাম-দত্ত অস্ত্রগুলি থাকিলে কর্ণ আজ কি না করিতে পারিতেন! কিন্তু হায়, নিজের দোষেই তিনি তাহা হারাইয়াছেন! পরশুরামের কাছে অস্ত্র-বিদ্যা শিখিতে গিয়া তিনি নিজেকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন! শেষে ধরা পড়িলে পরশুরাম তাঁহাকে এই বলিয়া শাপ দিয়াছিলেন, 'আমাকে ফাঁকি দিতে গিয়া তুই যে মহাপাপ করিয়াছিস্, সেই পাপে

মৃত্যুকালে এ সকল অস্ত্রের নাম পর্য্যন্ত তোর মনে আসিবে না।' সেই মহাশাপ আজ এই বিপদের সময়ে ফলিল।

ইহার উপর আবার এক সর্ব্বনাশ উপস্থিত। পরশু-রামের অস্ত্রে বঞ্চিত হইয়া কর্ণ হা-হুতাশ করিতেছেন, এমন সময় দেখিতে দেখিতে তাঁহার রথের চাকা মাটির ভিতর বসিয়া গেল।

ইহাও কর্ণের আর এক মহাপাপের ফল। কোন সময়ে তিনি এক ব্রাহ্মণের একটা গরু মারিয়া ফেলিয়াছিলেন! তাহাতে ব্রাহ্মণ এই বলিয়া শাপ দেন যে, 'যুদ্ধের অতি সঙ্কটকালে যখন তুই ভয়ে দিশাহারা হইয়া পড়িবি, তখন তোর রথের চাকা আপনা-আপনি মাটিতে বসিয়া যাইবে।' আজ এই দুঃখের দিনে ব্রাহ্মণের সেই অভিশাপও ফলিল।

আহা! কর্ণের তখন কি শোচনীয় অবস্থা! যে বীর ছেলেবেলা হইতে ভয় কাহাকে বলে জানেন না, আজ কি না তিনি ভয়ে ম্রিয়মাণ! যে বীর একা সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়াছেন, আজ কি না সামান্য একটা রথের চাকা টানিয়া তুলিতেও তিনি অক্ষম! শিরে করাঘাত করিতে করিতে কর্ণ কাঁদিয়া ফেলিলেন। অর্জ্জুনকে ডাকিয়া বলিলেন, "অর্জ্জুন' তুমি পরম ধার্ম্মিক; আমাকে রথের চাকা তুলিয়া লইতে সময় দাও। তারপর আবার যুদ্ধ করিব।"

কর্ণের কথায় রাগে কৃষ্ণের আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল।

তিনি বলিলেন, "ঐ মুখে আর ধর্ম্মের নাম লইও না! যখন শকুনির সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া যুধিষ্ঠিরকে পাশাখেলায় হারাইয়াছিলে, যখন দ্রৌপদীকে সভায় আনাইয়া দশজনে মিলিয়া অতি নীচভাবে অপমান করিয়াছিলে, যখন অসহায় বালক অভিমন্যুর উপর সকলে মিলিয়া দুরন্ত বাঘের মত চারিদিক্ হইতে পড়িয়া নিষ্ঠুরভাবে তাহাকে হত্যা করিয়াছিলে, তখন ধর্ম্ম ছিল কোথায়? ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া মুখ দিয়া রক্ত বাহির করিলেও আজ তোমার মরণ নিশ্চিত।"

লজ্জায় কর্ণের মাথা হেঁট্ হইয়া পড়িল। নিতান্ত নিরুপায় হইয়া তিনি হাতের কাছে যে অস্ত্র পাইলেন, তাহা-দ্বারাই অর্জ্জুনকে আঘাত করিতে লাগিলেন। শেষে এক প্রচণ্ড বাণে তাঁহাকে অজ্ঞান করিয়া তাড়াতাড়ি রথ হইতে নামিয়া পড়িলেন। কিন্তু হায়, যতই টানাটানি করেন, রথের চাকা ততই আরও বসিয়া যায়! কোন মতেই তিনি তাহা উঠাইতে পারিলেন ন!

অর্জ্জুন ততক্ষণে উঠিয়া বসিয়াছেন। কৃষ্ণের পরামর্শে তিনি তখন 'অঞ্জলীক' নামক এক ভীষণ বাণ গাণ্ডীবে যুড়িলেন! তাহার শব্দেই সকলের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। কর্ণ আবার রথে উঠিবার পূর্ব্বেই সেই সাংঘাতিক অস্ত্র ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। আর অমনি তাঁহার দেহ হইতে এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ বাহির হইয়া শূন্যে উঠিতে উঠিতে ক্রমে সূর্য্যের সহিত মিলাইয়া গেল।

কর্ণের মৃত্যুতে পাণ্ডবদের কি আনন্দ ! ভীমের সিংহনাদ, শত শত শঙ্খের গম্ভীর ধ্বনি আর সহস্র কণ্ঠের আনন্দ-কোলাহল একসঙ্গে মিলিয়া রণস্থল তোলপাড় করিতে লাগিল।

দুর্য্যোধনের জন্য বাস্তবিকই কষ্ট হয়। এত দিনের এত আশা-ভরসা আজ সমস্তই শেষ হইল। বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে তিনি শিবিরে ফিরিলেন।

এ সংবাদ হস্তিনায় পঁহুছিলে, ধৃতরাষ্ট্র নিতান্ত মর্ম্মাহত হইয়া 'হায়' 'হায়' করিতে লাগিলেন।

শল্যপর্ব্ব

দুর্য্যোধন যাঁহার ভরসায় ভীম, অর্জ্জুন অথবা কৃষ্ণ কাহাকেও গ্রাহ্য করিতেন না, সেই কর্ণও যখন নিহত হইলেন, তখন লোকে ভাবিল, এইবার নিশ্চয়ই যুদ্ধের শেষ হইবে ; পাণ্ডব-দের সঙ্গে সন্ধি করা ছাড়া আর উপায় নাই। কিন্তু দুর্য্যোধন যে প্রকৃতির লোক, তাহাতে তাঁহার নিকট হইতে এরূপ সুবুদ্ধি আশা করাই মূঢ়তার কাজ। তিনি যে আগুন জ্বালাইয়াছেন, তাহাতে সমস্ত পুড়াইয়া ছারখার না করিয়া ছাড়িবেন কেন ? কৃপাচার্য্য কত রকমেই না তাঁহাকে বুঝাইলেন, সন্ধির জন্য কত চেষ্টাই না করিলেন, কিন্তু কিছুতেই দুর্য্যাধনকে সুপথে ফিরাইয়া আনিতে পারিলেন না।

আবার যুদ্ধের আয়োজন চলিতে লাগিল। অশ্বত্থামার পরামর্শে দুর্য্যোধন মদ্ররাজ শল্যকে এবার কৌরবদলের সেনাপতি নিযুক্ত করিলেন।

এরূপ সম্মান-লাভে কাহার না আনন্দ হয় ? শল্য গর্ব্বের সহিত দুর্য্যোধনকে বলিলেন, "আমার তেজ তুমি যুদ্ধের সময় ভাল রকমেই দেখিতে পাইবে। পাণ্ডবেরা ত কোন্ ছার, দেবতাদেরও আমি গ্রাহ্য করি না।"

তিনি মুখে আরও অনেক কথা বলিলেন বটে, কিন্তু কাজের সময় এই নিয়ম করিলেন, যে, পাণ্ডবদের কাহাকেও

আক্রমণ করিতে হইলে, একা না গিয়া একেবারে দল বাঁধিয়া যাইতে হইবে এবং প্রত্যেকে প্রত্যেককে সাহায্য করিবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিবে।

পরদিন প্রভাত হইতে না হইতে শল্য আর ভীমে ভীষণ গদাযুদ্ধ বাধিয়া গেল। বীরত্বে কেহই কম নহেন; সুতরাং যুদ্ধটা কিছুক্ষণ বেশ ভাল রকমই চলিল। শেষে কিন্তু দুই-জনেই অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। তখন বেগতিক দেখিয়া কৃপাচার্য্য তাড়াতাড়ি শল্যকে লইয়া প্রস্থান করিলেন।

জ্ঞান হইলে শল্য ফিরিয়া আসিয়া যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করিলেন। এবার তাঁহার তেজের সীমা নাই। বাণে বাণে বিদ্ধ হইয়া যুধিষ্ঠির এই প্রতিজ্ঞা করিলেন,—'হয়, আজ জয়লাভ করিব; না হয়, শল্যের হাতে প্রাণ দিব।"

এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া তিনি সাত্যকি আর ধৃষ্টদ্যুম্নকে দুই পাশে এবং ভীম-অর্জ্জুনকে সম্মুখে ও পশ্চাতে রাখিয়া খুব তেজের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন! সেই মহাযুদ্ধে কখনও শল্যের বাণে যুধিষ্ঠির, কখনও বা যুধিষ্ঠিরের বাণে শল্য নিতান্ত কাতর হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের উৎসাহ কিছুতেই দমিল না।

উভয়কে শার্দ্দূলের ন্যায় রক্তাক্ত দেহে যুদ্ধ করিতে দেখিয়া ক্রমে দুই পক্ষের বড় বড় বীরগণও তাঁহাদের সহিত যোগ দিলেন।

ইহার পর আবার তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া গেল। কৃপা-

চার্য্যের বাণে যুধিষ্ঠিরের সারথির মুণ্ড লুটাইতে দেখিয়া সাত্যকি, শিখণ্ডী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন একসঙ্গে শল্যকে আক্রমণ করিলেন এবং ভীম তাঁহার ধনুক কাটিয়া, রথ ভাঙ্গিয়া ঘোড়াগুলিকে মারিয়া ফেলিলেন।

এইরূপে চারিদিক্ হইতে আক্রান্ত হইয়া শল্য খড়্গ লইয়া যুধিষ্ঠিরের দিকে ছুটিলে, ভীম এক ভল্ল-দ্বারা তাঁহার মুষ্টি কাটিয়া ফেলিলেন। কিন্তু তাহাতেও শল্যকে নিরস্ত করিতে পারিলেন না। তখন যুধিষ্ঠির এক প্রচণ্ড শক্তি ছুড়িয়া তাঁহাকে বধ করিলেন।

শল্যের মৃত্যুতে কৌরবসেনা একেবারে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। দুর্য্যোধন বহু কষ্টে তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনিয়া আবার যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন। এই সময়ে রাজা শাল্ব এক দুর্দ্দান্ত হাতীতে চড়িয়া তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিতে লাগিল। কিন্তু এভাবে আর কতক্ষণ যুদ্ধ চলিবে? শাল্ব ও তাহার হাতী মারা পড়িলে দুর্য্যোধন চারিদিক্ অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের এক শত পুত্রের মধ্যে দুর্য্যোধন ব্যতীত আর বারটি তখনও জীবিত ছিল! সেদিনকার যুদ্ধে ভীম এক এক করিয়া সেই বার জনকেও শেষ করিলেন।

বাকি ছিল শকুনি ও উলূক। তাহাদিগকে মারিয়া প্রতিজ্ঞামুক্ত হইতে সহদেবের অধিক বিলম্ব হইল না।

অতঃপর দুর্য্যোধন শুনিতে পাইলেন যে, পাণ্ডবেরা

চারিদিকে তাঁহার সন্ধান করিয়া ফিরিতেছেন। কাজেই পলায়ন ভিন্ন তখন তাঁহার আর কোন উপায়ই রহিল না!

রণভূমির নিকটেই দ্বৈপায়ন নামক হ্রদে একটি সুন্দর জল-স্তম্ভ ছিল। দুর্য্যোধন পলাইয়া সেই দিকে চলিলেন। পথে সঞ্জয়কে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সঞ্জয়, আমার ভাইগুলির আর সৈন্যদের কি দশা হইয়াছে, বলিতে পার ?"

সঞ্জয় বলিলেন, "মহারাজ, আমি স্বচক্ষে তাঁহাদের সকল-কেই নিহত হইতে দেখিয়াছি। কৃপ, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্ম্মা ছাড়া আমাদের দলের আর একটি প্রাণীও জীবিত নাই।"

দুঃখে দুর্য্যোধনের দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "বাবাকে এই সমস্ত সংবাদ দিও। আর বলিও, ঐ জলস্তম্ভের ভিতর লুকাইয়া আমি কোন রকমে এ যাত্রা প্রাণ বাঁচাইয়াছি।"

সঞ্জয়ের নিকট সংবাদ পাইবার কিছু পরেই কৃপ, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্ম্মা সেই স্তম্ভের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং দুর্য্যো-ধনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, উঠিয়া আইস। পাণ্ডবদের আর অধিক সৈন্য জীবিত নাই। আমরা চারিজনে মিলিয়া নিশ্চিতই উহাদের সব শেষ করিতে পারিব।"

এ কথায় দুর্য্যোধন বলিলেন, "আপনারা জীবিত আছেন, ইহাতে বড়ই সুখী হইলাম। আমার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত। এখন যুদ্ধ করা অসম্ভব। আজ বিশ্রাম করিয়া কাল আবার সকলে মিলিয়া যুদ্ধ করিব।"

অশ্বত্থামা তখন স্পর্দ্ধা করিয়া বলিলেন, "আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তোমার শত্রুদিগকে শেষ না করিয়া জলস্পর্শও করিব না।"

কয়েকজন ব্যাধ লুকাইয়া এই কথাগুলি শুনিতে পাইয়াছিল। পুরস্কারের লোভে তাহারা ভীমের নিকট গিয়া সমস্ত প্রকাশ করিয়া দিল।

পাণ্ডবেরা দুর্য্যোধনকে খুঁজিতে খুঁজিতে একেবারে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন! হঠাৎ তাঁহার সন্ধান পাইয়া তাঁহাদের কি উৎসাহ! ব্যাধদিগকে হাত ভরিয়া পুরস্কার দিয়া তাঁহারা তখনই সেই হ্রদের দিকে চলিলেন। ওদিকে দূর হইতে পাণ্ডবদের সাড়া পাইয়া অশ্বত্থামা প্রভৃতি কে যে কোথায় লুকাইলেন, তাহার ঠিকানা নাই।

হ্রদের তীরে উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, "দুর্য্যোধন ঐ স্তম্ভের মধ্যে লুকাইয়া আছে। আপনি গালাগালি করিতে থাকুন, তাহা হইলে নিশ্চতই সে বাহিরে আসিবে।"

শ্রীকৃষ্ণের কথায় যুধিষ্ঠির চীৎকার করিয়া বলিলেন, "দুর্য্যোধন, এই তোমার বীরত্ব! দেশশুদ্ধ লোককে যমালয়ে পাঠাইয়া তুমি কি না প্রাণভয়ে লুকাইয়া আছ? ছিঃ, ছিঃ, তোমার মনুষ্যত্বে ধিক্! যদি মানুষ বলিয়া পরিচয় দিতে চাও, বাহির হইয়া আসিয়া যুদ্ধ কর!"

দুর্য্যোধনের আর সহ্য হইল না। তিনি বলিলেন,

"প্রাণিমাত্রেরই প্রাণের ভয় থাকিবে, ইহা আর আশ্চর্য্য কি ? কিন্তু আমি সে জন্য পলায়ন করি নাই। একটু বিশ্রাম করিতেছি মাত্র! তোমরাও কিছুক্ষণ বিশ্রাম কর। তার পর তোমাদের যুদ্ধের সাধ মিটাইয়া দিব।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "আমাদের বিশ্রামের জন্য তোমাকে ব্যস্ত হইতে হইবে না। এখনই অসিয়া যুদ্ধ কর। তোমার ও আমার দুই জনেরই বাঁচিয়া থাকিবার আর উপায় নাই। হয়, আমাদের হাতে মরিয়া তুমি স্বর্গে যাও; না হয়, আমা-দিগকে মারিয়া রাজ্যভোগ কর।"

দুর্য্যোধন বলিলেন, "কি সুখে আর রাজ্যভোগ করিব! আমার আর কে আছে! এ রাজ্য এখন তোমরাই ভোগ কর। আমি বনে চলিয়া যাই।"

যখন যুধিষ্ঠির উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "তোমার ধৃষ্টতা ত কম নয়! আমরা কি তোমার কাছে ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি! রাজ্য ত কাড়িয়া লইবই, তাহার পূর্ব্বে তোমাকে শেষ না করিয়া ছাড়িব না।"

ইহার পর আর লুকাইয়া থাকা দুর্য্যোধনের পক্ষে অসম্ভব হইল। তিনি বাহির হইয়া আসিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "তোমাদের কাহাকেও আমি গ্রাহ্য করি না! যদি উপযুক্ত অস্ত্র পাই এবং ন্যায়মত যুদ্ধ কর, তাহা হইলে এখনও তোমাদিগকে উচিত শিক্ষা দিতে পারি।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "কোন্ মুখে ন্যায়ের কথা বলিতেছ ?

অভিমন্যুকে মারিবার সময় ন্যায়-জ্ঞান ছিল কোথায়? যাহা হউক, তুমি ইচ্ছামত অস্ত্র ও বর্ম্ম লও এবং আমাদের পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে যে কোন একজনের সহিত যুদ্ধ কর; তাহাকে বিনাশ করিতে পারিলেই সমস্ত রাজ্য তোমার হইবে।"

তখন দুর্য্যোধন বর্ম্মাদি পরিধান করিয়া উৎসাহের সহিত বলিলেন, "বেশ, যাহার খুসি আসিয়া গদাযুদ্ধ কর। দেখি, কে কেমন বীর!"

দুর্য্যোধনের কথা শেষ হইতে না হইতেই ভীম গদা হস্তে লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন, "আজ তুমি সাক্ষাৎ যমের মুখে পড়িয়াছ! এই হস্তে সমস্ত পশু শেষ করিয়াছি; আজ তোমাকে মারিয়া আমাদের সকল যন্ত্রণার শোধ লইব।"

যুধিষ্ঠিরের সাহস দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ আশ্চর্য্য হইলেন এবং একটু রাগও করিলেন। তিনি বলিলেন, "মহারাজ, কোন্ সাহসে অপনি এরূপ অদ্ভুত প্রস্তাব করিয়াছিলেন! দুর্য্যোধন যদি আপনাকে কিংবা অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব—এই তিন জনের মধ্যে কাহাকেও গদাযুদ্ধে আহ্বান করিত, তাহা হইলে কি সর্ব্বনাশ হইত, ভাবুন দেখি!"

এই সময় হঠাৎ সেখানে বলরামকে দেখিতে পাওয়া গেল। ভীম ও দুর্য্যোধন উভয়েই তাঁহার শিষ্য। তাঁহারা ভক্তিভরে প্রণাম করিলে, বলরাম আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "পবিত্র কুরুক্ষেত্রে গিয়া যুদ্ধ কর। সেখানে মরিলে স্বর্গলাভ হইবে।"

ইহার পর কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া ভীম ও দুর্য্যোধন ভীষণ গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের চলন-ফেরনের কায়দা ও ভঙ্গি দেখিয়া লোকে অবাক্ হইয়া রহিল। মনে হইল, ঠিক যেন দুইটি মত্ত হস্তী পরস্পরকে সংহার করিবার জন্য ছিদ্র খুঁজিয়া বেড়াইতেছে।

উভয়ের গদার শব্দই বা কি ভীষণ! শাঁই শাঁই রবে ঘুরিতে ঘুরিতে যখনই গদায় গদায় ধাক্কা লাগে, অমনি আগুন ছুটিতে থাকে। এই ভাবে অনেক ক্ষণ যুদ্ধ চলিল।

শেষে একবার সুবিধা পাইয়া দুর্য্যোধন ভীমের বুকে সজোরে আঘাত করিলেন। ইহাতে উত্তেজিত হইয়া ভীম বার বার প্রহার করিলেন বটে, কিন্তু কোন মতেই দুর্য্যোধনকে জব্দ করিতে পারিলেন না।

ভীমের শক্তি অনেক বেশী, কিন্তু গদাযুদ্ধে কেবল শক্তি থাকিলেই চলে না। কায়দা জানা চাই। সে বিষয়ে দুর্য্যোধন একেবারে সিদ্ধহস্ত। কাজেই ভীমের জন্য সকলকে একটু ভয় পাইতে হইল।

শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন, ন্যায়যুদ্ধে দুর্য্যোধনকে বধ করা অসম্ভব। তখন তাঁহার ইঙ্গিতে, অর্জ্জুন নিজের উরুতে আঘাত করিয়া ভীমকে সঙ্কেত করিলেন।

ভীমের বুঝিতে কিছু বাকি রহিল না। দুর্য্যোধনের উরু ভাঙ্গিয়া প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে হইবে! এই কথা ভাবিতে ভাবিতে তিনি আরও কিছুক্ষণ তেজের সহিত যুদ্ধ করিলেন।

ভীম ও দুর্যোধনের গদাযুদ্ধ।

তার পর ইচ্ছা করিয়া এমন সুযোগ দিলেন যেন, তাঁহার মস্তকে আঘাত করিবার জন্য দুর্য্যোধন লাফাইয়া উঠেন।

ভীমের ফন্দি কিন্তু দুর্য্যোধন বুঝিলেন না। মারিবার সুযোগ পাইয়া যেই তিনি লাফাইয়া উঠিয়াছেন, অমনি ভীম দারুণ আঘাতে তাঁহার দুই উরু এমন করিয়া ভাঙ্গিয়া দিলেন যে, দাড়াইয়া থাকাই তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল।

দুর্য্যোধনকে পড়িতে দেখিয়া ভীম ছুটিয়া গিয়া তাঁহার মস্তকে পদাঘাত করিতে করিতে বলিলেন, "এইবার পাশা খেলার কথা, দ্রৌপদীর অপমানের কথা এবং আমাদের নির্য্যাতনের কথা স্মরণ কর। আজ আমি প্রতিজ্ঞা হইতে মুক্ত হইলাম আর এই কালযুদ্ধও শেষ হইল।"

ভীমের এই ব্যবহারে কেহই সন্তুষ্ট হইলেন না। যুধিষ্ঠির তাঁহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। শেষে দুর্য্যোধনের কাছে গিয়া বলিলেন, "ভাই, বুদ্ধির দোষেই আজ তোমার এই দশা হইয়াছে। যাহা হউক, দুঃখ করিও না; আজই তুমি স্বর্গে চলিয়া যাইবে। আর আমরা আত্মীয়-বন্ধুর শোকে এখানে পড়িয়া হাহাকার করিতে থাকিব।" এই বলিতে বলিতে তিনি বার বার চোখের জল মুছিতে লাগিলেন।

এদিকে বলরাম ত চটিয়া লাল। গদা-যুদ্ধে নাভির নীচে মারিতে নাই। ভীম অন্যায় করিয়া দুর্য্যোধনকে মারিয়াছেন, এই রাগে তিনি লাঙ্গল উঠাইয়া ভীমের প্রতি ধাবিত হইলেন।

তখন শ্রীকৃষ্ণ নানা প্রকারে তাঁহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন, "ভীম সভামধ্যে দুর্য্যোধনের উরু-ভঙ্গের প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। ক্ষত্রিয় হইয়া তিনি সে প্রতিজ্ঞা পালন না করিয়া পারেন না।"

বলরাম বলিলেন, "তোমার এ সব যুক্তি কোন কাজেরই নহে।" এই বলিয়া রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে তিনি দ্বারকায় চলিয়া গেলেন।

পাণ্ডবেরা চলিয়া গেলে কৃপ, অশ্বত্থামা আর কৃতবর্ম্মা দুর্য্যোধনের নিকট আসিয়া চক্ষের জলে ভাসিতে লাগিলেন। হায়! হায়! যিনি পৃথিবীর সকল রাজার শ্রেষ্ঠ ছিলেন, এগার অক্ষৌহিণী সৈন্য যাঁহার যুদ্ধের বল ছিল, আজ কি না তাঁহার এই দশা!

অশ্বত্থামা রাগে ক্রমে উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন, "মহারাজ, আর সহ্য হয় না। তুমি অনুমতি দাও, আজই আমি তোমার শত্রুকুল নিঃশেষে সংহার করি।"

দুর্য্যোধনের কি শোচনীয় অবস্থা! কিন্তু তখনও তিনি হিংসা-দ্বেষ ভুলিতে পারেন নাই। অশ্বত্থামাকে সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া আবার নিবন্ত আগুন নূতন করিরা জ্বালাইয়া তুলিলেন। উৎসাহে অশ্বত্থামা প্রভৃতি সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

সৌপ্তিকপর্ব্ব

রাত্রি হইলে কৃপ, অশ্বত্থামা আর কৃতবর্ম্মা বিশ্রামের জন্য দুর্য্যোধনকে সেই স্থানে ত্যাগ করিয়া বনের ভিতর প্রবেশ করিলেন

সারাদিন পরিশ্রম করিয়া তিনজনেই অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কাজেই ঘোড়া হইতে নামিয়া একটা বট গাছের নীচে শুইবামাত্র কৃপ ও কৃতবর্ম্মা গাঢ় ঘুমে অচেতন হইয়া পড়িলেন। অশ্বত্থামার চোখে কিন্তু নিদ্রা নাই; কিরূপে পাণ্ডবদের বধ করিবেন, এই চিন্তায় তিনি অস্থির।

নিকটে এক গাছে কতকগুলি কাক সুখে নিদ্রা যাইতে-ছিল। হঠাৎ তিনি দেখিতে পাইলেন যে, একটা পেচক উড়িয়া আসিয়া সেই ঘুমন্ত কাকগুলিকে নিষ্ঠুরভাবে বধ করিতেছে! তিনি একদৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন! শেষে যখন দেখিলেন, পেচকের অত্যাচারে একটি কাকও রক্ষা পাইল না, তখন তাঁহার মনে হইল, 'এই ত বেশ সহজ উপায়। আমিও কেন এই উপায়ে শত্রুকুল নির্ম্মূল করি না!'

আর কি অশ্বত্থামা স্থির থাকিতে পারেন! তখনই সঙ্গীদিগকে উঠাইয়া আগ্রহের সহিত নিজ মনের কথা জানাইলেন। তার পর বলিলেন, "আর দেরী নয়, এখনই চল, কাজ শেষ করিয়া আসি।"

কৃপ আর কৃতবর্ম্মা ত অবাক্! ছিঃ ছিঃ, এমন নিষ্ঠুর কাজ মানুষেও করে! প্রথমে তাঁহারা খুবই আপত্তি করিলেন, শেষে কিন্তু অশ্বত্থামার অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না।

স্বয়ং মহাদেব তখন ছদ্মবেশে পাণ্ডব-শিবিরের দ্বার রক্ষা করিতেছিলেন! অশ্বত্থামা প্রভৃতি সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, প্রহরীকে না তাড়াইতে পারিলে ভিতরে প্রবেশ করা অসম্ভব। তখন তাঁহারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু অস্ত্রে মহাদেবের কি হইবে? অশ্বত্থামা যতই অস্ত্র মারেন, সবই তিনি গিলিয়া ফেলেন।

ব্যাপার দেখিয়া তিনজনেই হতবুদ্ধি! এমন সময় হঠাৎ অশ্বত্থামার দিব্যচক্ষু ফুটিল। প্রহরী যে স্বয়ং মহাদেব, ইহা বুঝিতে পারিয়া অশ্বত্থামা একমনে তাঁহার স্তুতি আরম্ভ করিয়া দিলেন।

ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ হইতে আর কি বাকি থাকে? মহাদেব খুশী হইয়া দ্বার ত ছাড়িলেনই, এমন কি, অশ্বত্থামাকে একখানা খড়্গ দিতেও ভুলিলেন না।

মহাদেব প্রস্থান করিলে, কৃপ ও কৃতবর্ম্মাকে দরজায় রাখিয়া অশ্বত্থামা সেই খড়্গ লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। তার পর শিবির-মধ্যে যে ভয়ানক হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হইল, তাহা মনে করিতেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়!

ধৃষ্টদ্যুম্ন নিশ্চিন্তমনে ঘুমাইতেছিলেন; অশ্বত্থামা সর্ব্বাগ্রে তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিয়া পদাঘাত করিতে করিতে তাঁহাকে

শেষ করিয়া ফেলিলেন। তার পর এক এক করিয়া দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রকেও কাটিয়া, পাণ্ডবদের যে যেখানে ছিল, স্ত্রীলোক ছাড়া, প্রায় সকলই যমালয়ে পাঠাইলেন। যাহারা পলাইতে চেষ্টা করিয়াছিল, কৃপ ও কৃতবর্ম্মার অস্ত্র এড়ান তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইল!

শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে পাণ্ডবেরা পাঁচ ভাই আর সাত্যকি সে রাত্রে শিবিরে বাস করেন নাই। নচেৎ কি সর্ব্বনাশই না হইত!

ইহার পর কৃপ, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্ম্মা আহ্লাদে নাচিতে নাচিতে যখন দুর্য্যোধনের নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার মৃত্যু আসন্ন। হাত-পা একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে; কেবল বুকের কাছে একটু ধুক্ ধুক্ করিতেছে। শৃগাল প্রভৃতি জন্তুগণ মাংসের লোভে তাঁহার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

দুর্য্যোধনের দিকে চাহিয়া তাঁহাদের বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। অশ্বত্থামা চীৎকার করিয়া বলিলেন, "হে মহারাজ, এই শেষ সময়ে তোমাকে আনন্দের সংবাদ দিতেছি। তোমার শত্রুকুল প্রায় শেষ হইয়াছে। পাণ্ডব-শিবিরে স্ত্রীলোক ছাড়া আর একটিও প্রাণী জীবিত নাই। পঞ্চপাণ্ডব, কৃষ্ণ ও সাত্যকি শিবিরে ছিলেন না বলিয়াই রক্ষা পাইয়াছেন।"

এ সংবাদে দুর্য্যোধন মুহূর্ত্তের জন্য যেন নূতন জীবন লাভ করিলেন। তাঁহার শুষ্ক মলিন মুখে আনন্দের হাসি ফুটিয়া

উঠিল। তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া দুর্য্যোধন ধীরে ধীরে বলিলেন, "আর আমার কোন দুঃখ নাই ; আজ আমি ইন্দ্রের ন্যায় সুখী। আপনাদের মঙ্গল হউক।" এই বলিয়া তিনি চিরনিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

এদিকে প্রভাত হইতে না হইতে পাণ্ডব-শিবিরে ভয়ানক কান্নার রোল উঠিল। যুধিষ্ঠির প্রভৃতির ত কথাই নাই, যে কৃষ্ণ কত দুঃখের দিনে পাণ্ডবের মনে সান্ত্বনা দিয়াছেন, তাঁহাদের শোকের অশ্রু মুছাইয়াছেন, আজ তাঁহার চক্ষেও জল! দ্রৌপদী কাঁদিতে কাঁদিতে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। তার পর যখন জ্ঞান হইল, তিনি উত্তেজনার সহিত বলিলেন, "এখনই সেই দুর্বৃত্ত অশ্বত্থামাকে মারিয়া, তাহার মাথার মণি আনিয়া না দিলে আমি অনাহারে প্রাণত্যাগ করিব!"

শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি দ্রৌপদীকে কত বুঝাইলেন, কিন্তু তাঁহার মুখে সেই একই কথা—"আমি সে মণি চাই!"

দ্রৌপদীর ক্রন্দন ভীম আর সহ্য করিতে পারিলেন না। তখনই নকুলকে রথের সারথি করিয়া অশ্বত্থামার সন্ধানে বাহির হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন, মহা বিপদ্! অশ্বত্থামার কাছে 'ব্রহ্মশির' নামে দ্রোণাচার্য্যের যে মহাস্ত্র আছে, যদি রাগের ভরে তিনি সেই অস্ত্র মারিয়া বসেন, তবে ভীমকে রক্ষা করাই অসম্ভব হইবে। সেই জন্য তাড়াতাড়ি যুধিষ্ঠির আর অর্জ্জুনকে লইয়া তিনিও ভীমের পিছন্ পিছন্ রথ ছুটাইয়া দিলেন।

দুর্য্যোধনের শেষাবস্থা

পাণ্ডবদের ভয়ে অশ্বত্থামা তখন ব্যাসদেবের আশ্রমে গিয়া লুকাইয়া ছিলেন। দূর হইতে ভীমকে দেখিয়াই তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল। তার পর ভীমের পশ্চাতে যখন যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে দেখিলেন, তখন নিতান্ত ভয় পাইয়া 'পাণ্ডব-বংশ লোপ হউক' বলিয়া তিনি সেই সর্ব্বনেশে অস্ত্রটি ছাড়িয়া বসিলেন।

এতক্ষণ কৃষ্ণ যে ভয় করিতেছিলেন, তাহাই হইল। তখন অর্জ্জুন আর কি করেন, তাঁহার কাছে দ্রোণের যে দিব্যাস্ত্র ছিল, অশ্বত্থামার অস্ত্র নিবারণ করিবার জন্য তাহা না ছাড়িয়া পারিলেন না।

অমনি সেই দুই মহা অস্ত্রের তেজে স্বর্গ-মর্ত্ত্যে ভীষণ তোলপাড় আরম্ভ হইল। সৃষ্টি বুঝি লোপ পায়।

সর্ব্বনাশের উপক্রম দেখিয়া নারদ ও ব্যাস আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। মুনিদ্বয় ছুটিয়া আসিয়া সেই দুই অস্ত্রের মাঝখানে দাঁড়াইয়া, উভয়কে আপন আপন অস্ত্র থামাইতে অনুরোধ করিলেন।

যাঁহার মনে বিন্দুমাত্র কুভাব নাই, অস্ত্র থামান তাঁহার পক্ষে খুবই সহজ, কিন্তু যাহার মন সেরূপ নহে, অস্ত্র থামাইতে গেলে তাহা দ্বারা তিনি নিজেই মারা পড়েন।

অর্জ্জুন সাধু পুরুষ। অস্ত্র থামাইতে তাঁহার কোনই কষ্ট নাই, কিন্তু অশ্বত্থামার সে সাহসই হইল না! তিনি বলিলেন, "পাণ্ডবদের ভয়েই আমি অস্ত্র ছাড়িয়াছিলাম। যদি

থামাইতে চেষ্টা করি, তবে ঐ অস্ত্রে আমার নিজের মাথা কাটা যাইবে। এখন উপায় ?"

তখন মুনিরা মধ্যস্থ হইয়া এই স্থির করিয়া দিলেন যে, অশ্বত্থামার অস্ত্রে উত্তরার শিশু পুত্রটি মারা যাইবে। আর অশ্বত্থামা তাঁহার মাথার মণি দিয়া পাণ্ডবদিগকে সন্তুষ্ট করিবেন।

শিশুটি তখনও ভূমিষ্ঠ হয় নাই। ভূমিষ্ঠ হইলে মরা ছেলে কৃষ্ণের প্রসাদে আবার বাঁচিয়া উঠিল। তাহার নাম হইল 'পরীক্ষিৎ'।

আর এদিকে অশ্বত্থামার মাথার মণি যুধিষ্ঠিরের মাথায় পরাইয়া দ্রৌপদী সেই দারুণ শোকের ভিতরেও একটু শান্তি পাইলেন।

———

স্ত্রীপর্ব

দুর্য্যোধনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কুরুক্ষেত্রের ভীষণ যুদ্ধ শেষ হইল। আঠার দিন ধরিয়া যুদ্ধ চলিয়াছিল; এই আঠার দিনে আঠার অক্ষৌহিণী লোক প্রাণ হারাইল! কুরুক্ষেত্র মহাশ্মশানে পরিণত হইল।

সঞ্জয় কাঁদিতে কাঁদিতে এই সর্ব্বনাশের সংবাদ লইয়া আসিলে, হস্তিনার ঘরে ঘরে ক্রন্দনের রোল উঠিল। লোকে একটি পুত্র হারাইলে পাগল হইয়া যায়; ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী এক শত পুত্র হারাইয়াছেন; আজ তাঁহাদের প্রাণে যে কি দারুণ যাতনা, কে তাহা বর্ণনা করিতে পারে? আর বিধবা পুত্রবধূগুলির দিকে তাকাইলে, এমন পাষাণ কে আছে, যাহার বুক না ফাটিয়া যায়!

ব্যাস, বিদুর প্রভৃতি কত রকমেই না তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন, কিন্তু সে ব্যথা কি কেহ ভুলিতে পারে! যাহা হউক, তাঁহারা কতকটা স্থির হইলে, বিদুর বলিলেন, "মহারাজ, যাহা হইবার হইয়াছে; আপনি জ্ঞানী ও সুপণ্ডিত; এখন মৃত আত্মীয়-স্বজনের শ্রাদ্ধের আয়োজন করুন্।"

বিদুরের কথায় ধৃতরাষ্ট্র গৃহের স্ত্রী-পুরুষ সকলকে লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন। পাণ্ডবেরা আগেই সেখানে গিয়া-

ছিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া সকলের শোক আবার উথলিয়া উঠিল। ধৃতরাষ্ট্র এমনই অস্থির হইলেন যে, যুধিষ্ঠির প্রণাম করিতে আসিল, প্রথমে ভাল করিয়া কথাই বলিতে পারিলেন না। শেষে বিরক্তভাবে দুই একটিমাত্র কথা বলিয়া ভীমকে দেখিতে চাহিলেন। সে সময় তাঁহার মুখ দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারা গেল যে, ভীমকে পাইলে তিনি সহজে ছাড়িবেন না—হয় ত বা মারিয়াই ফেলিবেন।

এইরূপ যে ঘটিবে, শ্রীকৃষ্ণ ইহা পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছিলেন এবং ইহার জন্য প্রস্তুতও হইয়া আসিয়াছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র ভীমকে দেখিতে চাহিলে, কৃষ্ণ ভীমের একটা লৌহমূর্ত্তি আনাইয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিলেন। অন্ধরাজ উহাকেই প্রকৃত ভীম ভাবিয়া আলিঙ্গন করিবার ছলে এমন জোরে চাপিয়া ধরিলেন যে, মূর্ত্তিটা একেবারে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল।

রাগের বশে এই কাণ্ড করিয়া পর মুহূর্ত্তেই ধৃতরাষ্ট্র আবার ভীমের জন্য অস্থির হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, "হায় হায়! কি সর্ব্বনাশই করিলাম! কেন আমার এ দুর্ম্মতি হইল!"

তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে প্রকৃত ঘটনা বুঝাইয়া দিয়া, শেষে বলিলেন, "এই সর্ব্বনাশের জন্য আপনার পুত্রেরাই দায়ী; পাণ্ডবদের দোষী করা কখনই উচিত নয়।"

কৃষ্ণের কথায় ধৃতরাষ্ট্র নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া যার-

পর-নাই লজ্জিত হইলেন। শেষে সকলকে স্নেহালিঙ্গন দিয়া সান্ত্বনা লাভ করিলেন।

ব্যাসদেবের উপদেশে গান্ধারীর হৃদয় পূর্ব্বেই বিদ্বেষশূন্য হইয়াছিল। কিন্তু তথাপি তাঁহার কাছে যাইতে পাণ্ডবেরা বিশেষ ভয় পাইতেছিলেন। কেন না, সেই ধার্ম্মিকা রমণী ক্রোধে যদি শাপ দিয়া বসেন, তাহা হইলে আর রক্ষা থাকিবে না।

কিন্তু যে রমণী জীবনে কখনও একটি অন্যায় কাজ করেন নাই, 'ধর্ম্মের জয় এবং অধর্ম্মের ক্ষয়' ইহাই যাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র, সেই গান্ধারী কি রাগের বশে শাপ দিয়া পাণ্ডবদের সর্ব্বনাশ করিতে পারেন? যুদ্ধে যাইবার পূর্ব্বে দুর্য্যোধন তাঁহার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন, তখন সামান্য নারী হইলে তিনি পুত্রেরই জয় কামনা করিতেন কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "ধর্ম্মের জয় হউক।"

হৃদয় যাঁহার এত উচ্চ, অকারণে পাণ্ডবদের প্রতি বিদ্বেষ-ভাব পোষণ করা তাঁহার পক্ষে কি সম্ভব? যুধিষ্ঠির প্রভৃতি চরণে প্রণত হইলে, তিনি কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া সকলকে আশীর্ব্বাদ-দানে কৃতার্থ করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের উপর কিন্তু গান্ধারীর রাগ কিছুতেই কমিল না! কৃষ্ণকে নিকটে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "তুমি না বলিতে কৌরব ও পাণ্ডব—উভয় পক্ষই তোমার নিকট সমান! কাজের সময় সে কথা রাখিতে পারিলে কই? আজ এই

যে সর্ব্বনাশ হইয়াছে, ইহার মূলে তোমারই কূটবুদ্ধি! ভাবিও না, তুমি সহজে পরিত্রাণ পাইবে। নিশ্চিত জানিও, একদিন তোমারও সর্ব্বনাশ হইবে। আজ যেমন কৌরবনারীরা শ্মশানে পড়িয়া হাহাকার করিতেছে, একদিন তোমার (যদু) বংশের নারীরাও পতিপুত্রশোকে এমনি হাহাকার করিবে।"

কৃষ্ণ আর কি বলিলেন, অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ইহার পর সকলের সৎকারের আয়োজন হইতে লাগিল। রাশি রাশি শবের ভিতর হইতে এক একটি পুত্রের মৃতদেহ বাহির হয় আর ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী বুকফাটা ক্রন্দনে দশ দিক্ পূর্ণ করিতে থাকেন! ক্রমে একশত পুত্রের মৃতদেহ দেখিয়া তাঁহারা অবসন্ন হইয়া পড়িলেন।

পাশাপাশি এক সঙ্গে অসংখ্য চিতা জ্বলিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে কাহারও আর চিহ্নমাত্রও রহিল না। দাহকার্য্য শেষ হইলে, সকলে স্নান ও তর্পণের জন্য গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন।

এই বার কুন্তী শোকে অধীর হইয়া উঠিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে পাণ্ডবদিগকে বলিলেন, "কর্ণের উদ্দেশে তর্পণ কর। সে আমার জ্যেষ্ঠপুত্র—তোমাদের সহোদর ভাই।"

এ কি অসম্ভব কথা! যাঁহাকে মারিবার জন্য এত আয়োজন, যাঁহাকে মারিয়া এত আনন্দ, সেই কর্ণ কি না পাণ্ডবদের সহোদর ভাই!

যুধিষ্ঠির হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। শেষে যাতনায় অস্থির হইয়া কুন্তীকে বলিলেন, "মা, এমন নিষ্ঠুর তুমি কেন হইলে? যাঁহাকে পূজা করিয়া আমরা ধন্য হইতাম, যিনি আমাদের মাথায় থাকিবার যোগ্য, আমাদের দ্বারা কেন তাঁহাকে বধ করাইলে! কুরুরাজ্য কেন এমন করিয়া ছারখার করাইলে! হায় হায়! ভুলিয়াও যদি আগে একটু আভাস দিতে!"

শান্তিপর্ব

কর্ণের শোক যুধিষ্ঠির কিছুতেই ভুলিতে পারিলেন না। যতই দিন যাইতে লাগিল, তাঁহার বেদনা যেন আরও বাড়িয়া উঠিল। যে রাজ্যের জন্য আত্মীয়-স্বজন, এমন কি, সহোদর ভাইকেও বধ করিতে হইয়াছে, ঘৃণায় তাহার প্রতি চাহিতেও তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। তিনি রাজসম্পদ্ ছাড়িয়া বনে যাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন!

ভীম, অর্জ্জুন প্রভৃতি চারি ভাই এবং দ্রৌপদী তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মন রাজ্যের প্রতি আকৃষ্ট হইল না।

অবশেষে ব্যাস ও কৃষ্ণ নানাপ্রকারে তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। ব্যাস বলিলেন, "হস্তিনাবাসিগণ তোমাকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে! এ সময় সেখানে না যাওয়া ভাল দেখায় না। অভিষেকের পর উপযুক্ত লোকজনের উপর রাজকার্য্যের ভার দিয়া তুমি ভীষ্মের সহিত দেখা করিও। তাঁহার উপদেশে তোমার সকল দুঃখ ঘুচিবে!" কৃষ্ণও সেই কথা বলিলেন।

এই দুই মহাপুরুষের বাক্যে মনের দুঃখ অনেকটা কমিলে, যুধিষ্ঠির অন্ধরাজ প্রভৃতি আত্মীয়-স্বজন এবং সহোদরগণকে লইয়া হস্তিনা যাত্রা করিলেন।

দেশবাসিগণ কি আনন্দে যুধিষ্ঠিরকে অভ্যর্থনা করিলেন, তাহা আর কি বলিব। চারিদিকে নৃত্য, গীত, আনন্দ-কোলাহল আর শঙ্খের মঙ্গলধ্বনি।

এই সময় চার্ব্বাক্ নামে এক রাক্ষস যুধিষ্ঠিরকে পীড়ন করিতে আসিয়া হাতে হাতে তাহার প্রতিফল পাইল। এই চার্ব্বাক্ ছিল দুর্য্যোধনের পরম বন্ধু। ভিখারী ব্রাহ্মণের বেশে যুধিষ্ঠিরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সে বলিল, "মহারাজ, ব্রাহ্মণেরা মুখে আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছে বটে, কিন্তু মনে মনে গালি দিতেছে! আপনার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।"

তাহাকে সত্য সত্য ব্রাহ্মণ মনে করিয়া যুধিষ্ঠির বড়ই ভয় পাইলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে সাহস দিয়া বলিলেন, "মহারাজ, এই দুষ্টের কথা সমস্ত মিথ্যা! আমরা আপনাকে গালি দিব কেন? বরং প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছি, আপনার মঙ্গল হউক। দুর্য্যোধনের বন্ধু বলিয়াই এই পাপাত্মা আপনার মৃত্যু কামনা করিতেছে। আপনি ভয় পাইবেন না।" এই বলিয়া তাঁহারা সক্রোধে চার্ব্বাকের দিকে চাহিবামাত্র সে ভস্ম হইয়া গেল!

তার পর খুব জাঁকজমকে যুধিষ্ঠিরের অভিষেককার্য্য সম্পন্ন হইল। রাজা হইয়া তিনি ভীমকে যুবরাজ, অর্জ্জুনকে শত্রু-শাসক, নকুলকে সেনাপতি, সহদেবকে দেহরক্ষক, সঞ্জয়কে আয়ব্যয়-পরীক্ষক এবং বিদুরকে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়া রাজকার্য্য পরিচালনার সুন্দর ব্যবস্থা করিলেন।

অবশেষে যুধিষ্ঠির ভাই-বন্ধু সকলকে লইয়া কৃষ্ণের সহিত ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইলেন। সেই মহাপুরুষ তখনও শরশয্যায় থাকিয়া সূর্য্যের উত্তরায়ণের অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহার চারিদিকে নারদ, ব্যাস, জৈমিনি প্রভৃতি ঋষিগণ উপবিষ্ট ছিলেন। সেই পবিত্র স্থানটি ঠিক যেন তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল!

পাণ্ডবদিগকে দেখিয়া ভীষ্মের বড়ই আনন্দ হইল। যুধিষ্ঠির প্রভৃতি ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। কৃষ্ণ বলিলেন, "হে মহাপুরুষ, আপনার স্বর্গারোহণের আর অধিক বিলম্ব নাই। যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া আপনার নিকট আসিয়াছেন। যাহাতে তিনি শান্তি পান, আপনি দয়া করিয়া এমন উপদেশ দান করুন্।" এই বলিয়া কৃষ্ণ ভীষ্মের সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া তাঁহার সকল যন্ত্রণা দূর করিয়া দিলেন।

তখন পিতামহ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "ভাই, যুদ্ধ করিয়া তুমি ত কোন অন্যায় কাজ কর নাই, তবে কেন শোক করিতেছ? কিছুদিন এখানে থাক! আমি যতদূর পারি, তোমার মনের দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা করিব।" ইহার পর ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বহু অমূল্য উপদেশ প্রদান করিলেন। সে সকল অমৃতমাখা কথা শুনিয়া যুধিষ্ঠিরের বুক জুড়াইয়া গেল।

অনুশাসনপর্ব

ভীষ্মের উপদেশে মনের সকল যন্ত্রণা দূর হইলে, যুধিষ্ঠির তাঁহাকে প্রণাম করিয়া হস্তিনায় ফিরিলেন। বিদায়কালে ভীষ্ম বলিলেন, "সূর্য্যের উত্তরায়ণ আরম্ভ হইতে আর বিলম্ব নাই। মাঘ মাসের শুক্লপক্ষে আমি প্রাণত্যাগ করিব। ঐ সময়ে আবার আসিও।'

হস্তিনাবাসিগণ যুধিষ্ঠিরের স্থির, শান্ত, প্রসন্ন মুখ দেখিয়া যার-পর নাই সুখী হইল। রাজ্যের প্রতি তাঁহার মন আকৃষ্ট হইয়াছে, ইহা কি কম আনন্দের কথা!

কিন্তু রাজকার্য্যে ভাল করিয়া হাত দিবার পূর্ব্বেই মাঘ মাস আসিয়া উপস্থিত হইল। এই সময় ভীষ্মের স্বর্গারোহণ করিবার কথা। সুতরাং হস্তিনার ছোট বড় সকলকে লইয়া যুধিষ্ঠির আবার কুরুক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন।

সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা দেখিলেন, বহু ঋষি-মুনি, সাধু-সজ্জন ভীষ্মকে আবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন; ধূপ-ধূনার সুগন্ধে চারিদিক্ ভরপূর! সুমধুর সাম-গানে সকলে আত্মহারা! এমন অপূর্ব্ব দৃশ্য পৃথিবীতে আর কখনও দেখা যায় নাই।

পাণ্ডবদের দেখিয়া ভীষ্ম আহ্লাদের সহিত বলিলেন, "এ সময় তোমাদিগকে না দেখিলে আমার মনে ভয়ানক একটা

দুঃখ থাকিয়া যাইত। আটান্নদিন আমি শর-শয্যায় বাস করিয়াছি। আজ শুভদিনে পৃথিবী হইতে বিদায় লইব।"

এ কথায় কেহই আর চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারিলেন না। ভীষ্ম সকলকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "আমার জন্য শোক করিও না। পিতার বরে আমি মৃত্যুকে জয় করিয়াছিলাম; ইচ্ছা করিয়াই আজ চলিয়া যাইতেছি। এই আনন্দের দিনে তোমাদের প্রফুল্ল মুখ দেখিয়া যেন সুখী হই।"

ইহার পর সকলকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ জানাইয়া এবং একে একে সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া ভীষ্ম একমনে ভগবানের চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। ক্রমে তাঁহার শরীর হইতে সমস্ত শর খসিয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে তাঁহার পবিত্র আত্মা স্বর্গে চলিয়া গেল। দেবতাগণ দুন্দুভি বাজাইয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন।

অবশেষে বহুমূল্য পট্টবস্ত্র পরাইয়া চন্দন কাষ্ঠে ভীষ্মের পবিত্র দেহ দাহ করিয়া সকলে উদাস মনে নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

আশ্বমেধিকপর্ব্ব

ভীষ্মদেবের শ্রাদ্ধাদি শেষ হইলে পর, শ্রীকৃষ্ণ, ব্যাস প্রভৃতি যুধিষ্ঠিরকে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে উপদেশ দিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "এই যজ্ঞ করিলে একদিকে যেমন পুণ্যসঞ্চয় হইবে, অপরদিকে তেমনি মনের সকল অশান্তি দূর হইবে।"

এ কথায় যুধিষ্ঠিরের খুব উৎসাহ হইল বটে, কিন্তু সহসা এত বড় ব্যাপারে হাত দিতে তাঁহার সাহস হইল না।

অশ্বমেধ অতি কঠিন যজ্ঞ। ইহাতে বহু অর্থের প্রয়োজন। অথচ ধন-রত্ন যাহা ছিল, যুদ্ধে সমস্তই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে; রাজকোষ একেবারে শূন্য। এ অবস্থায় কিরূপে যে যজ্ঞ করা যাইতে পারে, যুধিষ্ঠির ভাবিয়া কূল-কিনারা পাইলেন না।

তখন ব্যাসদেব বলিলেন, "বৎস, অর্থের জন্য চিন্তা নাই। আমি তোমাকে অর্থের সন্ধান বলিয়া দিতেছি। বহুকাল পূর্ব্বে মহারাজ মরুত্ত হিমালয়-পর্ব্বতে এক বৃহৎ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞে তিনি ব্রাহ্মণদিগকে এত রাশি রাশি ধন দান করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা তাহা বহিয়া লইয়া শেষ করিতে পারেন নাই। এখনও সেখানে প্রচুর ধন পড়িয়া আছে। তাহা আনাইতে পারিলে, তুমি অনায়াসেই অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে পারিবে।"

ব্যাসদেবের কথায় যুধিষ্ঠির তখনই মন্ত্রী ও ভাইদের সহিত

পরামর্শ করিয়া সেই সকল ধন আনাইবার ব্যবস্থা করিলেন। লক্ষ লক্ষ হাতী, ঘোড়া, উট, রথ, গাড়ী বোঝাই করিয়াও তাহা শেষ হইল না। সেই অগাধ ধনরাশি হস্তিনায় পঁহুছিলে যুধিষ্ঠিরের অর্থের সকল অভাব ঘুচিয়া গেল।

ইহার পর একটি সুলক্ষণ অশ্বের কপালে জয়পত্র বাঁধিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল। ঘোড়াটি এক বৎসর পৃথিবীর সকল রাজ্য ঘুরিয়া বেড়াইবে। তার পর ফিরিয়া আসিলে উহার মাংসে অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন হইবে।

ঘোড়াটি যাহাতে কেহ আট্‌কাইতে সাহস না করে, সেই উদ্দেশ্যে অর্জ্জুন তাহার রক্ষক হইয়া চলিলেন। যাত্রাকালে যুধিষ্ঠির বলিলেন, "নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে কাহাকেও বধ করিও না। আর ছোট বড় কাহাকেও যেন নিমন্ত্রণ হইতে বাদ দিও না।"

যজ্ঞের অশ্ব প্রথমে উত্তর দিকে গমন করিল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যে সকল রাজা পাণ্ডবদের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধরগণ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ পণ্ড করিবার জন্য ঘোড়া আট্‌কাইতে বিধিমতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু অর্জ্জুনের হস্তে সকলকেই পরাজিত হইতে হইল।

ইহার পর ঘোড়া ত্রিগর্ত্ত দেশে উপস্থিত হইল। সেখানকার রাজা ও কুমারগণ ঘোড়া আট্‌কাইয়া যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হইলে, অর্জ্জুন প্রথমে মিষ্ট কথায় তাঁহাদের বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কোন মতেই যখন তাঁহারা ঘোড়া

ছাড়িলেন না, তখন অর্জ্জুনকে বাধ্য হইয়া রক্তপাত করিতে হইল। দুই চারি জন নিহত হইলে আর সকলে হাত জোড় করিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা চাহিলেন।

সেখান হইতে ঘোড়া প্রাগ্‌জ্যোতিষে উপস্থিত হইল। ভগদত্তের পুত্র বজ্রদত্ত তখন সেখানকার রাজা। অর্জ্জুনকে দেখিয়া বজ্রদত্ত চীৎকার করিয়া বলিল, "আজ তোমাকে মারিয়া পিতার মৃত্যুর শোধ লইব।" কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হইলে তাহাকে জব্দ করিতে অর্জ্জুনকে কিছুমাত্র ক্লেশ পাইতে হইল না। যুধিষ্ঠিরের আদেশ মান্য করিয়াই অর্জ্জুন তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন।

সিন্ধুদেশের লোকেরাও ঘোড়া আটক করিয়া অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিতে ত্রুটি করিল না। ক্রমে তাহারা যখন অত্যন্ত বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিল, তখন অর্জ্জুনও একদিক্ হইতে সব শেষ করিতে লাগিলেন।

লোকের হাহাকারে জয়দ্রথের স্ত্রী (ধৃতরাষ্ট্রের কন্যা) দুঃশলা তাঁহার শিশু পৌত্রটিকে কোলে লইয়া অর্জ্জুনের কাছে আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "ভাই, আমার স্বামী যুদ্ধে হত হইলে, আমার একমাত্র পুত্র সুরথ পিতার শোকে নিতান্ত কাতর হইয়া পড়ে। তোমার আগমন-সংবাদ পাইয়াই আজ সে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। তাহার এই শিশু পুত্রটিই এখন আমার একমাত্র অবলম্বন।"

দুঃশলা ও তাঁহার পৌত্রকে দেখিয়া অর্জ্জুনের প্রাণে দারুণ

আঘাত লাগিল। তিনি গাণ্ডীব ফেলিয়া চোখের জল মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "ধিক্ ক্ষত্রিয় ধর্ম্মে!" শেষে নানা রকম মিষ্ট কথায় দুঃশলাকে সান্ত্বনা দিয়া অর্জ্জুন তাঁহার নিকট বিদায় লইলেন!

ইহার পর যজ্ঞের ঘোড়া মণিপুরে উপস্থিত হইল। রাজ-কুমারী চিত্রাঙ্গদার সহিত অর্জ্জুনের বিবাহ হইয়াছিল। সেই চিত্রাঙ্গদার পুত্র বভ্রুবাহন এখন মণিপুরের রাজা। পিতার আগমন সংবাদ পাইয়া তিনি বিনীতভাবে আসিয়া অর্জ্জুনের সহিত দেখা করিলেন।

অর্জ্জুন কিন্তু তাঁহাকে এইভাবে আসিতে দেখিয়া একটুও সন্তুষ্ট হইলেন না; বলিলেন, "আমি এখন মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বরক্ষায় নিযুক্ত হইয়া তোমার রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছি, পিতারূপে আসি নাই। কাপুরুষের ন্যায় হাতযোড় না করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।"

এ কথায় বভ্রুবাহন হঠাৎ যেন থতমত খাইয়া গেলেন। তার পর কি করা উচিত ভাবিতেছেন, এমন সময় সহসা নাগকন্যা উলূপী (অর্জ্জুনের আর এক স্ত্রী) সেখানে আসিয়া বলিলেন, "বৎস, আমি তোমার বিমাতা। তোমার পিতা যখন যুদ্ধে আহ্বান করিতেছেন, তখন তাঁহার সহিত যুদ্ধ করাই তোমার কর্ত্তব্য।"

ইহার পর পিতাপুত্রে অতি ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে। কুরুক্ষেত্রের মহা সমরের পর এমন যুদ্ধ আর হয় নাই।

সেই যুদ্ধে পুত্রের এক ভীষণ বাণে অর্জ্জুন মৃতপ্রায় হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে অজ্ঞান হইতে দেখিয়া দুঃখে বভ্রুবাহনও জ্ঞান হারাইলেন।

তখন চিত্রাঙ্গদা কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, "উলূপী, তোমার মনে এই ছিল। পুত্রের দ্বারা পিতাকে হত্যা করাইয়া কি সর্ব্বনাশ করিলে, একবার ভাবিয়া দেখ!"

ইতিমধ্যে বভ্রুবাহনের জ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছে। উলূপীকে সম্মুখে দেখিয়া তিনিও তাঁহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন; শেষে বলিলেন, "তোমার কথায় আমি মহাপাপ করিলাম; মৃত্যু ভিন্ন ইহার আর প্রায়শ্চিত্ত নাই!"

উলূপী কিন্তু কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া বলিলেন, "বৎস, ব্যস্ত হইও না! আমি মন্দ উদ্দেশ্যে এ কাজ করি নাই। তোমার পিতা শিখণ্ডীকে সম্মুখে রাখিয়া ভীষ্মকে বধ করিয়াছিলেন। এই অপরাধে গঙ্গাদেবী তাঁহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হন। তিনি তোমার পিতাকে শাপ দিতে উদ্যত হইলে, আমি হাতে পায়ে ধরিয়া তাঁহাকে শান্ত করি। তখন তিনি বলিয়াছিলেন, 'বভ্রুবাহনের হস্তে মৃত্যু না হইলে অর্জ্জুনের পাপ কাটিবে না।' এই জন্যই আমি তোমাকে যুদ্ধে উৎসাহিত করিয়াছি!" এই বলিয়া উলূপী নাগলোক হইতে সঞ্জীবনী মণি আনাইয়া অর্জ্জুনের বক্ষে রাখিবামাত্র তিনি চক্ষু মেলিয়া উঠিয়া বসিলেন। উলূপীর চেষ্টাতেই অর্জ্জুন রক্ষা পাইলেন দেখিয়া সকলে যার-পর নাই সুখী হইলেন।

ইহার পর মগধ, চেদী, গান্ধার, দ্বারকা প্রভৃতি সকল দেশের সকল রাজাকে নিমন্ত্রণ করিয়া অর্জ্জুন ঠিক এক বৎসর পরে হস্তিনায় ফিরিয়া আসিলেন।

এইবার মহা ধূমধামে যজ্ঞ আরম্ভ হইল। অতিথি-অভ্যাগতের আনন্দ-কোলাহলে হস্তিনা ভরপূর! যেমন সমারোহ ব্যাপার, আহারাদিরও তেমনই সুবন্দোবস্ত এবং দান-দক্ষিণার আয়োজনও তেমনি প্রচুর। মহাযজ্ঞ সম্পন্ন হইলে, যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণদিগকে কোটি কোটি স্বর্ণমুদ্রা এবং দীন-দরিদ্রদিগকে অপরিমিত ধন দান করিয়া আপ্যায়িত করিলেন।

তারপর যুধিষ্ঠিরকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে সকলে আপন আপন দেশে চলিয়া গেলেন।

আশ্রমবাসিকপর্ব

এতকাল ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী হস্তিনাতেই বাস করিতেছিলেন। যুধিষ্ঠির তাঁহাদের জন্য যাহা করিতেন, দুর্য্যোধন প্রভৃতিও সেরূপ পারিতেন না। তাঁহার ভক্তি ও ভালবাসায় অন্ধরাজ আর গান্ধারী পুত্রশোক পর্য্যন্ত ভুলিয়া গেলেন।

যুধিষ্ঠিরের ন্যায় অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, কুন্তী এবং দ্রৌপদীও তাঁহাদিগকে যথেষ্ট সম্মানের চক্ষে দেখিতেন। তাঁহাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যাহা কিছু করা সম্ভব, ইঁহারা তাহার কিছুই বাকি রাখেন নাই।

ভীম কিন্তু পূর্ব্ব ব্যবহারের কথা স্মরণ করিয়া কিছুতেই ধৃতরাষ্ট্রকে দেখিতে পারিতেন না। যতই দিন যাইতে লাগিল, ভীমের এই ভাব ততই বাড়িয়া চলিল। সুবিধা পাইলেই তিনি অন্ধরাজকে অসম্মান করিতেন।

এই ভাবে পনর বৎসর কাটিলে, একদিন যুধিষ্ঠিরের অসাক্ষাতে ভীম ধৃতরাষ্ট্রের সহিত এমন রূঢ় ব্যবহার করিলেন যে, অন্ধরাজের বক্ষে তাহা শেলের ন্যায় বিদ্ধ হইল। বন্ধুগণের সহিত কথা কহিতে কহিতে ভীম ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে শুনাইয়া গর্ব্বের সহিত বলিলেন, "এই একই হস্তে ধৃতরাষ্ট্রের এক শত পুত্রকে যমালয়ে পাঠাইয়াছি!"

বুদ্ধিমতী গান্ধারী এ কথা শুনিয়াও শুনিলেন না; কিন্তু

ধৃতরাষ্ট্রের প্রাণে ইহাতে বড়ই ব্যথা লাগিল। তিনি বিদুর, যুধিষ্ঠির প্রভৃতিকে ডাকাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "আমার দোষেই কুরুকুল ধ্বংস হইয়াছে! তোমাদের সু-পরামর্শ তখন গ্রাহ্য করি নাই, এখন তাহার ফলভোগ করিতেছি।"

"সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ আমি ও গান্ধারী এখন দিন-শেষে একবারমাত্র যৎসামান্য আহার করি এবং সুকোমল শয্যা ত্যাগ করিয়া মাদুরে শয়ন করি। পাছে যুধিষ্ঠির ব্যথা পায়, তাই এ কথা এতদিন কাহাকেও বলি নাই।"

এইটুকু বলিয়াই হঠাৎ তাঁহার বাক্‌রোধ উপস্থিত হইল। যাহা হউক, কোন মতে সে ভাব সাম্‌লাইয়া লইয়া তিনি যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বৎস, আমাদের তিন কাল গিয়া এক কালে ঠেকিয়াছে। তুমি অনুমতি দাও, আমরা বনে গিয়া তপস্যা করি।"

ধৃতরাষ্ট্রের কথায় যুধিষ্ঠিরের চক্ষে জল আসিল! তিনি অন্ধরাজের পায়ের উপর পড়িয়া বলিলেন, "আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করুন্। আপনারা অনাহারে অনিদ্রায় দিন কাটাইয়াছেন আর আমি নিজের সুখ লইয়াই ব্যস্ত আছি। হায়, হায়, এ পাপের প্রায়শ্চিত্তও নাই। আপনারা ক্ষমা না করিলে এ রাজ্যের অমঙ্গল হইবে। আপনাদের চরণ-সেবায় বঞ্চিত হওয়া অপেক্ষা মৃত্যুই ভাল!"

ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে দুই হাতে ধরিয়া উঠাইয়া বলিলেন, "না,

বাবা, তোমার কোনই ত্রুটি হয় নাই। তোমার কাছে যে সুখে আছি, দুর্য্যোধন প্রভৃতিও আমাদিগকে তত সুখে রাখিতে পারে নাই। তবে কি না, বৃদ্ধ বয়সে বনে যাওয়াই আমাদের কুলধর্ম্ম। আমাদের একান্ত ইচ্ছা যে, বনে গিয়া তপস্যা করি, তুমি বাধা দিও না!"

যুধিষ্ঠির আর কি বলিবেন! নানা রকমে বুঝাইয়াও যখন ধৃতরাষ্ট্রের মত ফিরাইতে পারিলেন না, তখন বাধ্য হইয়া তাঁহাকে সম্মত হইতে হইল।

ইহার পর কার্ত্তিক-পূর্ণিমার শুভদিনে ধৃতরাষ্ট্র আর গান্ধারী সকলের নিকট বিদায় লইয়া বিদুর ও সঞ্জয়ের সহিত গৃহ হইতে বাহির হইলেন। শোকে হা-হুতাশ করিতে করিতে পাণ্ডবেরা পাঁচ ভাই, কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, উত্তরা এবং পুরবাসিগণ তাঁহাদের পিছন্ পিছন্ চলিলেন। সকলেই কাঁদিয়া আকুল। কে কাহাকে সান্ত্বনা দেয়!

নগরের বাহিরে উপস্থিত হইলে, ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী যুধিষ্ঠির প্রভৃতিকে গৃহে ফিরিয়া যাইবার জন্য বার বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের কথায় আর সকলেই ফিরিলেন, কিন্তু বিদুর, সঞ্জয় ও কুন্তী কোন মতেই তাঁহাদের সঙ্গ ছাড়িতে চাহিলেন না।

কুন্তীও যে পাণ্ডবদের ছাড়িয়া যাইবেন, এই কথা কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই। পাঁচ ভাই যাতনায় অস্থির হইয়া জননীর চরণে লুটাইয়া পড়িলেন; কত রকমে তাঁহাকে বন-

গমন হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই তাঁহার সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন না। অগত্যা তাঁহারা কাঁদিতে কাঁদিতে হস্তিনায় চলিয়া আসিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী প্রভৃতি সমস্ত দিন চলিয়া সন্ধ্যাকালে ভাগীরথী-তীরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে কয়েকদিন বিশ্রাম করিয়া কুরুক্ষেত্রে গমন করিলেন। সেই স্থানটি অতি মনোহর; চারিদিকেই মুনি-ঋষির আশ্রম; তাঁহাদের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সকলে কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। দেখিতে দেখিতে কয়েক মাস কাটিয়া গেল।

এদিকে পাণ্ডবেরা গৃহে ফিরিলেন বটে কিন্তু জননী এবং অন্যান্য গুরুজনদিগের শোকে তাঁহারা চারিদিক্ অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠিরের পক্ষে রাজকার্য্যে মনোযোগ দেওয়া কঠিন হইয়া উঠিল। শেষে কোন রকমেই মন স্থির করিতে না পরিয়া, একদিন সকলে মিলিয়া ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন।

অন্ধরাজ, গান্ধারী প্রভৃতি তখন যমুনায় স্নান করিতে গিয়াছিলেন। দূর হইতে তাঁহাদিগকে আসিতে দেখিয়া পাঁচ ভাই ছুটিয়া গিয়া সকলকে প্রণাম করিলেন এবং তাঁহাদের হস্ত হইতে জলের কলস লইয়া আশ্রমে ফিরিলেন।

আশ্রমে আসিয়া পাণ্ডবেরা দেখিতে পাইলেন, আর সকলেই সেখানে আছেন, কেবল বিদুর নাই। তাঁহাকে দেখিবার জন্য যুধিষ্ঠিরের মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাকাকে দেখিতেছি না কেন? তিনি কোথায়?"

অন্ধরাজ বলিলেন, "বিদুর অতি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি নিবিড় অরণ্যে একাকী বাস করেন; অনাহারে অস্থি-চর্ম্ম-সার হইয়াছেন। মাঝে মাঝে তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়।"

এই সময় হঠাৎ আশ্রমের সম্মুখে বিদুরকে দেখিতে পাওয়া গেল। তাঁহাকে বনের দিকে যাইতে দেখিয়া যুধিষ্ঠির 'কাকা' 'কাকা' বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে সেই দিকে ছুটিলেন। বিদুর একটি কথাও বলিলেন না। শেষে তাঁহাকে একটি গাছের নীচে দাঁড়াইতে দেখিয়া যুধিষ্ঠিরও সেখানে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু বিদুর আর তখন জীবিত নাই! যুধিষ্ঠির আসিবার পূর্ব্বেই তাঁহার পবিত্র আত্মা পৃথিবী ছাড়িয়া স্বর্গে চলিয়া গিয়াছে।

বিদুরের শোকে যুধিষ্ঠির কাঁদিতে কাঁদিতে আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। তখন কেহই আর চক্ষের জল রাখিতে পারিলেন না।

এই সময় ব্যাসদেব আসিয়া সকলকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "বিদুরের জন্য তোমরা শোক করিও না। মাণ্ডব্য মুনির শাপে স্বয়ং ধর্ম্ম বিদুররূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এখন তিনি স্বর্গে অতি উচ্চস্থান লাভ করিয়াছেন।"

ইহার পর মহর্ষি ব্যাস যোগবলে এক অতি অদ্ভুত কাজ

করিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যত বীর নিহত হইয়াছিল, তাহাদের সকলকে সজীব অবস্থায় ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তীর সম্মুখে উপস্থিত করিলেন! সেই সময় ব্যাসের আশীর্ব্বাদে ধৃতরাষ্ট্রের চক্ষুও ফুটিল। এই ব্যাপারে সকলেই অবাক্। প্রাণ ভরিয়া পুত্রগণকে দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী প্রভৃতির যে কি আনন্দ, তাহা বলিয়া বুঝান যায় না। কিছুকালের জন্য মর্ত্য যেন স্বর্গে পরিণত হইল।

ব্যাসদেব প্রস্থান করিলে, পাণ্ডবেরা আরও কিছুকাল সেই আশ্রমেই বাস করিলেন। তার পর সকলের পদধূলি লইয়া হস্তিনায় ফিরিয়া আসিলেন।

ইহার ঠিক দুই বৎসর পরে একদিন নারদ আসিয়া যুধিষ্ঠিরকে সংবাদ দিলেন যে, ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তী দাবানলে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন এবং সঞ্জয় কোন প্রকারে রক্ষা পাইয়া হিমালয়ে চলিয়া গিয়াছেন।

এই নিদারুণ সংবাদে হস্তিনায় আবার ভয়ানক শোকের ক্রন্দন উঠিল। যুধিষ্ঠির প্রভৃতি হাহাকার করিতে করিতে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন।

নারদ অতি কষ্টে তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিলেন। যথা সময়ে মৃত ব্যক্তিগণের শ্রাদ্ধশান্তি শেষ হইলে।

মৌষলপর্ব্ব

যুধিষ্ঠিরের রাজত্বের তখন ঠিক ছত্রিশ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে, তখন দ্বারকার চারিদিকে নানা অমঙ্গলের লক্ষণ দেখা যইতে ল্যাগিল। গান্ধারীর অভিশাপের কথা স্মরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বুঝিলেন, এইবার আর রক্ষা নাই !

এই সময় একদিন মহর্ষি বিশ্বামিত্র, কণ্ব ও নারদ কৃষ্ণের সহিত দেখা করিতে আসিলে, দ্বারকার কয়েকটি দুষ্ট বালক একটা লৌহ মুষলের কথা লইয়া তাঁহাদিগকে উপহাস করে। ইহাতে তাঁহারা ক্রোধভরে শাপ দেন,—"এই মুষলই তোদের সর্ব্বনাশের কারণ হইবে। কৃষ্ণ ও বলরাম ছাড়া যদুবংশের আর কেহই রক্ষা পাইবে না।"

এ কথা শ্রীকৃষ্ণের কাণে পঁহুছিলে, তিনি কিছুমাত্র ব্যস্ত হইলেন না কিংবা বিপদ্ নিবারণের কোন চেষ্টাও করিলেন না। বালকেরা কিন্তু ভয় পাইয়া মুষলটা খণ্ড খণ্ড করিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দিল।

মুষল নষ্ট করিয়া তাহারা নিশ্চিন্ত হইল বটে কিন্তু ঋষিদের শাপ ত মিথ্যা হইবার নয়! অতি সামান্য কারণ হইতেই একদিন সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইল !

যাদবেরা প্রায়ই আমোদ-আহ্লাদের জন্য প্রভাস-তীর্থে যাইত। একদিন সেখানে গিয়া মদ খাইয়া তাহারা অত্যন্ত

উন্মত্ত হইয়া উঠিল এবং শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতেই পশুর মত পরস্পরের সহিত মারামারি করিতে লাগিল।

ক্রমে বেশ ছোট-খাট একটি যুদ্ধ বাধিয়া গেল। সমুদ্র-তীরে যথেষ্ট শর-বন ছিল। এক একটি শর হাতে লইবামাত্র এক একটি মুষল হইয়া উঠিল। সেই মুষলই হইল যুদ্ধের প্রধান অস্ত্র।

এই যুদ্ধে বহু লোক মারা পড়িল। শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন ও তাঁহার শিষ্য সাত্যকি নিহত হইলে, ক্রোধভরে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং একটি শর উঠাইয়া লইলেন। ঐ শর মুষলে পরিণত হইলে, উহাদ্বারা তিনি সকলকেই যমালয়ে পাঠাইলেন।

ইহার পর কৃষ্ণ সারথি দারুককে সঙ্গে লইয়া বলরামের সন্ধানে বাহির হইলেন। বলরাম তখন জঙ্গলের মধ্যে ধ্যান-মগ্ন ছিলেন। তাঁহাকে কোনরূপ ব্যস্ত না করিয়া, কৃষ্ণ দারুককে বলিলেন, "তুমি হস্তিনায় গিয়া অর্জ্জুনকে লইয়া আইস। আমি বাড়ী গিয়া স্ত্রীলোকদিগের রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া আবার এইখানেই ফিরিয়া আসিব।"

কৃষ্ণের পিতা বসুদেব তখনও জীবিত ছিলেন। তাঁহাকে সকল সংবাদ দিয়া কৃষ্ণ বলিলেন, "অর্জ্জুন না আসা পর্য্যন্ত আপনি স্ত্রীলোকদিগকে রক্ষা করুন।" এই বলিয়া তিনি আবার বলরামের কাছে চলিয়া আসিলেন কিন্তু সেখানে আসিয়া দেখেন, বলরামের মুখ হইতে একটা সহস্রফণা ভয়ঙ্কর সাপ বাহির হইয়া ক্রমশঃ সমুদ্রের দিকে চলিয়াছে।

ব্যাপার দেখিয়া কৃষ্ণের আর বুঝিতে বাকি রহিল না যে, বলরাম এই ভাবে দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন।

বলরামের মৃত্যুতে কৃষ্ণ বড়ই আঘাত পাইলেন। ইহার পর কি করা কর্ত্তব্য, এই ভাবিতে ভাবিতে তিনি বনের ভিতরে প্রবেশ করিলেন। সেখানে একটা গাছের ছায়ায় বসিয়া চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় এক ব্যাধ মৃগভ্রমে তাঁহাকে বিদ্ধ করিল। হরিণ মরিয়াছে ভাবিয়া ব্যাধ চক্ষের নিমিষে সেখানে আসিয়া যাহা দেখিল, তাঁহাতে ভয়ে সে একেবারে আড়ষ্ট। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কিছুমাত্র বিরক্ত না হইয়া তাহাকে অভয় দান করিয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

এদিকে অর্জ্জুন দ্বারকায় পঁহুছিবামাত্র বসুদেব প্রাণত্যাগ করিলেন। দ্বারকার অবস্থা দেখিয়া অর্জ্জুনের মুখ দিয়া কথা সরিল না। বিশেষতঃ কৃষ্ণের অভাবে তিনি জগৎ যেন শূন্য বোধ করিতে লাগিলেন।

কিন্তু তখন শোকের সময় নহে। অর্জ্জুন শুনিয়াছিলেন, কৃষ্ণ চলিয়া যাইবার পরই দ্বারকা সমুদ্রের জলে ডুবিয়া যাইবে। সেইজন্য তাড়াতাড়ি মৃত যাদবগণের সৎকার কার্য্য শেষ করিয়া তিনি স্ত্রীলোকদিগকে লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা দ্বারকা পরিত্যাগ করিবামাত্র সমুদ্র আসিয়া সে দেশ গ্রাস করিয়া ফেলিল।

ইন্দ্রপ্রস্থের পথে একদল ডাকাতের হাতে পড়িয়া তাঁহাদের দুর্দ্দশার অবধি রহিল না। যে অস্ত্রে অর্জ্জুন

এক সময়ে স্বর্গ-মর্ত্ত্য জয় করিয়াছেন, কুরুক্ষেত্র শ্মশানে পরিণত করিয়াছেন, সেই গাণ্ডীব উঠাইয়া দস্যুদলকে শাসন করেন—আজ তাঁহার এতটুকু শক্তিও নাই। কৃষ্ণ চলিয়া যাওয়ায় তিনি একেবারে শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছেন।

কাজেই অর্জ্জুনকে দস্যুদের সকল অত্যাচার নীরবে সহ্য করিতে হইল। ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হইয়া আর এক দণ্ডও তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না; ব্যাসদেবের নিকট গিয়া প্রাণের সকল ব্যথা জানাইয়া বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন।

মহর্ষি ব্যাস তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "বৎস অর্জ্জুন, এই পৃথিবীতে তোমাদের কাজ ফুরাইয়াছে। তাই তুমি শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছ। এখন এস্থান ত্যাগ করিয়া স্বর্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত হও।"

মহাপ্রস্থানিকপর্ব্ব

অর্জ্জুনের নিকট যদুবংশের নিধন ও শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গগমনের সংবাদ পাইয়া যুধিষ্ঠির দেহত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলেন। ধর্ম্মরাজের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদী সকলেই একবাক্যে বলিলেন, "মহারাজ, আমরাও আপনার সহিত মহাপ্রস্থান করিব।"

ইহার পর পরীক্ষিতের উপর রাজ্যের ভার দিয়া পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী হস্তিনা হইতে বাহির হইলেন। প্রজাগণ কাঁদিতে কাঁদিতে পথে আসিয়া দাঁড়াইল। সকলে কত রকমেই না তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পাণ্ডবেরা কিছুতেই তাঁহাদের সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন না।

সেই সময় একটি কুকুরও হস্তিনা হইতে পাণ্ডবদের অনুগামী হইল।

সর্ব্বপ্রথম যুধিষ্ঠির, তার পর ভীম-অর্জ্জুন, তার পর নকুল-সহদেব, তার পর দ্রৌপদী, সকলের শেষে কুকুরটি! এই ভাবে চলিতে চলিতে কত গ্রাম, কত নগর, কত পাহাড়-পর্ব্বত, নদ-নদী পার হইয়া তাঁহারা সমুদ্রের তীরে আসিয়া পঁহুছিলেন। সেখানে স্বয়ং অগ্নিদেব অর্জ্জুনকে দেখা দিয়া তাঁহার গাণ্ডীব ফিরাইয়া লইলেন।

তার পর সকলে ক্রমাগত উত্তর দিকে চলিতে লাগিলেন।

হিমালয়-পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া, কতক দূর আরোহণ করিলে, হঠাৎ দ্রৌপদীর হাত-পা অসাড় হইয়া আসিল। অল্লক্ষণ পরেই তিনি পড়িয়া গিয়া প্রাণ হারাইলেন।

ইহা দেখিয়া ভীম যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, দ্রৌপদী ত জীবনে কোন অন্যায় কাজ করেন নাই, তবে তিনি সশরীরে স্বর্গে যাইতে পারিলেন না কেন?"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "দ্রৌপদীর নিকট আমরা সকলে সমান হইলেও তিনি অর্জ্জুনকে অধিক ভালবাসিতেন! এই পাপেই তাঁহার মৃত্যু হইল।"

আর কিছু দূর গিয়া সহদেব পড়িয়া গেলেন। ভীম তাঁহার পতনের কারণ জিজ্ঞাসা করলে, যুধিষ্ঠির বলিলেন, "সহদেব নিজেকে সর্ব্বাপেক্ষা বিজ্ঞ বলিয়া মনে করিত। ইহাই তাহার পতনের কারণ।"

আরও কিছু দূর গিয়া নকুলও পড়িলেন। তখন ভীম যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, ধর্ম্মের প্রতি নকুলের ত খুবই আসক্তি ছিল, তবে তাহার পতন হইল কেন?"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "নকুল যে পরম ধার্ম্মিক ছিল, সে কথা সত্য। কিন্তু নকুলের মনে অহঙ্কার ছিল যে, তাহার মত সুন্দর পুরুষ আর নাই। এই অহঙ্কারের জন্যই উহার পতন হইল।"

ইহার পর অর্জ্জুন পড়িলে, ভীম জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, অর্জ্জুন ত ভুলিয়াও কখনও মিথ্যা কথা বলে নাই বা

দ্রৌপদীর পতন

কোন অন্যায় কাজ করে নাই। তবে তাহার এমন দশা হইল কেন ?”

যুধিষ্ঠির বলিলেন, “অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, এক দিনেই সকল শত্রু সংহার করিবে, কিন্তু তাহা রক্ষা করিতে পারে নাই। ইহাই তাহার মৃত্যুর কারণ।”

সর্ব্বশেষে ভীম পড়িতে পড়িতে যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহারাজ, আমি ত সর্ব্বদাই আপনার অনুগত ছিলাম। তবে কি অপরাধে আমার এ দুর্দ্দশা হইল ?”

যুধিষ্ঠির বলিলেন, “তুমি মনে করিতে যে, তোমার মত বলবান্ আর নাই। এই অহঙ্কারই তোমার পতনের কারণ।”

তার পর যুধিষ্ঠির আপন মনে চলিতে লাগিলেন। কুকুরটি ছাড়া সে সময় তাঁহার আর কোন সঙ্গী রহিল না।

কিছু দূর অগ্রসর হইলে, দেবরাজ ইন্দ্র পুষ্পক-রথ লইয়া আসিয়া বলিলেন, “মহারাজ, এই রথ তোমার জন্য। ইহাতে চড়িয়া স্বর্গে চল !”

যুধিষ্ঠির। চারি ভাই ও দ্রৌপদীকে ছাড়িয়া স্বর্গে যাইতে আমার ইচ্ছা নাই।

ইন্দ্র। সে কি মহারাজ, তাহারা ত পূর্ব্বেই স্বর্গে গিয়াছে। আর বিলম্ব করিও না। সেখানে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইবে !

এ কথায় যুধিষ্ঠির সেই কুকুরটিকে লইয়া রথে উঠিবার উপক্রম করিলেন। তখন ইন্দ্র বলিলেন, “ছিঃ ছিঃ, কুকুর

অতি অপবিত্র জীব। যে কুকুরের সঙ্গে থাকে, তাহারও স্বর্গলাভ হয় না। অতএব শীঘ্র উহাকে ত্যাগ কর।"

যুধিষ্ঠির। আশ্রিতজনকে ত্যাগ করা মহাপাপ! আমি স্বর্গে না যাই সেও ভাল, তবু ইহাকে ছাড়িতে পারিব না!

ইন্দ্র। একটা কুকুরের জন্য তুমি স্বর্গের সুখ তুচ্ছ করিবে? কি আশ্চর্য্য! দ্রৌপদীকে ছাড়িলে, চারি ভাইকে ছাড়িলে, আর একটা কুকুর ছাড়িতে পার না?

যুধিষ্ঠির। আমি ত ইচ্ছা করিয়া তাঁহাদিগকে ছাড়ি নাই; তাঁহারাই বরং আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছেন। আর এই কুকুর বিনা আহ্বানেই আমার সঙ্গে আসিয়াছে। যে আমাকে এত ভালবাসে, তাহাকে ছাড়িয়া আমি স্বর্গেও যাইতে চাহি না।

এই সময় এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। সেই কুকুরটি দেখিতে দেখিতে ধর্ম্মের আকার ধারণ করিয়া যুধিষ্ঠিরের কাছে আসিয়া বলিলেন, "বৎস, আমি স্বয়ং ধর্ম্ম। তোমাকে পরীক্ষা করিবার জন্যই কুকুরের বেশ ধরিয়াছিলাম। সামান্য একটা কুকুরের জন্য তুমি স্বর্গের সুখ তুচ্ছ করিতে প্রস্তুত, ইহাতেই বুঝিয়াছি, তোমার মত ধার্ম্মিক আর নাই।"

এই বলিয়া ধর্ম্ম ইন্দ্রের রথে চড়াইয়া যুধিষ্ঠিরকে সশরীরে স্বর্গে লইয়া গেলেন!

স্বর্গারোহণপর্ব

যুধিষ্ঠির স্বর্গে গিয়া ভীম, অর্জ্জুন প্রভৃতি কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া যেমন দুঃখিত হইলেন, দুর্য্যোধনকে দেখিয়া তেমনই আশ্চর্য্য বোধ করিলেন! তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া নারদ বলিলেন, "বৎস, দুর্য্যোধন ধর্ম্মযুদ্ধে প্রাণ দিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার স্বর্গলাভ হইয়াছে, আর ভীমার্জ্জুন প্রভৃতি সামান্য যাহা কিছু পাপ করিয়াছেন, এখন নরকে তাহার ফল ভোগ করিতেছেন।"

তখন যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন, "কর্ণ কোথায়? ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব এবং দ্রৌপদীই বা কোথায়? তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য আমার প্রাণ অস্থির হইয়াছে। তাঁহারা যেখানে আছেন, সে স্থান যেমনই হউক, আমাকে সেখানে লইয়া চলুন।"

এ কথায় ইন্দ্র একজন দেবদূতকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি অবিলম্বে যুধিষ্ঠিরকে তাঁহার আত্মীয়গণের নিকট লইয়া যাও।"

দেবদূত তৎক্ষণাৎ যুধিষ্ঠিরকে এক অতি ভীষণ পথ দিয়া লইয়া চলিল। সে পথে বাতাসের নামগন্ধও নাই। দিনের বেলাতেও সেখানে আলো প্রবেশ করিতে পারে না। কৃমি, কীট আর রক্তমাংসের কর্দ্দমে ও দুর্গন্ধে পথটি পূর্ণ। চারিদিক

নিস্তব্ধ, কেবল দুই ধারে যে সকল অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছে হইতে পাপীদের কাতর আর্ত্তনাদ শুনা যাইতেছে। সে দৃশ্য দেখিবামাত্র প্রাণ শিহরিয়া উঠে!

যুধিষ্ঠির আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলেন, ' ভীষণ পথ! মহাশয়, আমার ভাইয়েরা সব কোথায়? কোথায়? এ পথে আর কত দূর যাইতে হইবে? আর ত পারি না।"

দেবদূত বলিলেন, "মহারাজ, যদি ক্লান্ত হইয়া থাকেন, আর নাই বা গেলেন; চলুন, ফিরিয়া যাই।"

দূতের কথায় যুধিষ্ঠির ফিরিলেন। অমনি চারিদিক্ হইতে ক্রন্দনধ্বনি উঠিল, "মহারাজ, বহু দিন পরে তোমার দেখা পাইয়া আমাদের দগ্ধ হৃদয় জুড়াইয়া গেল! আর কিছুক্ষণ থাক!"

এই করুণ ক্রন্দনে যুধিষ্ঠিরের প্রাণ গলিয়া গেল। তিনি ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে দুঃখার্ত্ত ব্যক্তিগণ! তোমরা কে? কি নিমিত্তই বা এখানে দগ্ধ হইতেছ?"

অমনি চারিদিক্ হইতে—'আমি কর্ণ' 'আমি ভীম' 'আমি অর্জ্জুন' 'আমি নকুল' 'আমি সহদেব' 'আমি দ্রৌপদী' এই শব্দ উত্থিত হইল!

অদৃষ্টের কি নিদারুণ পরিহাস! যাঁহারা একটি দিনের জন্যও পুণ্যপথ হইতে ভ্রষ্ট হয়েন নাই, তাঁহাদের স্থান হইল নরকে! আর পাপের যাঁহারা প্রতিমূর্ত্তি বলিলেই হয়,